২৩ শ্রাবণ ১৩৯১ □ ৮ আগস্ট ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা

আনন্দমেলা

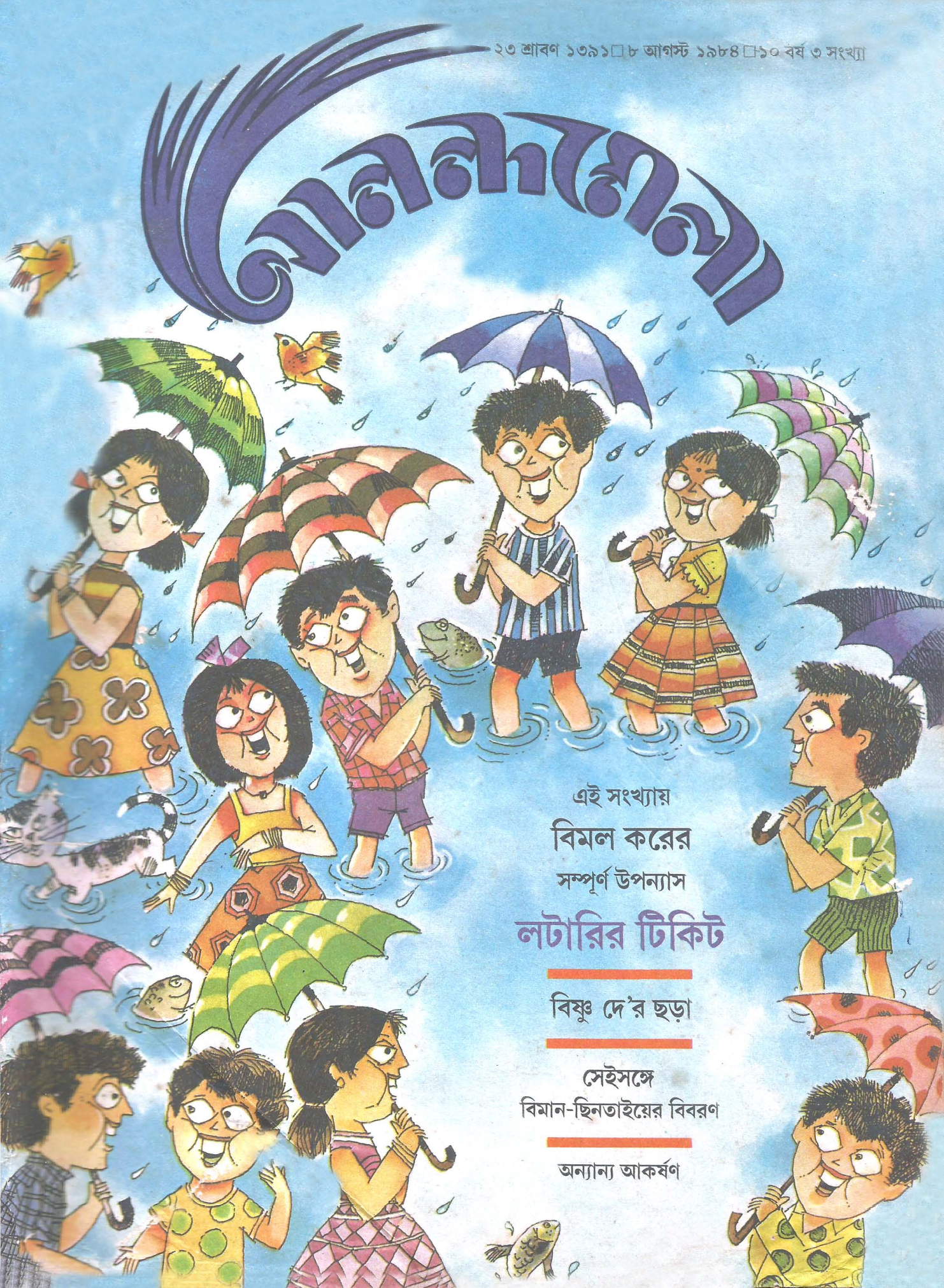

এই সংখ্যায়

বিমল করের

সম্পূর্ণ উপন্যাস

লটারির টিকিট

বিষ্ণু দে'র ছড়া

সেইসঙ্গে

বিমান-ছিনতাইয়ের বিবরণ

অন্যান্য আকর্ষণ

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পেতে ট্যালকম পাউডার নয়, নাইসিল চাই।

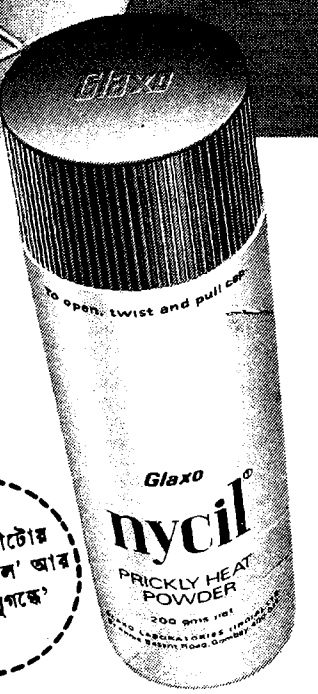

নাইসিল লাগান

ঘামাচির কষ্ট থেকে চট্পট্ আরাম পান।

২ রকম কৌটোয় পাবেন—'নীল' আর 'চন্দন সুগন্ধে'

নাইসিল হ'ল এক ওষুধ মেশানো পাউডার। ঘামাচির সবরকম কষ্ট থেকে সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেওয়ার জন্যেই এটি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। এটি চুলকানি, জ্বালাভাব থেকে নিমেষে আরাম দেয় আর ঘামাচি ছড়িয়ে পড়া রোধ করে, যা ট্যালকম পাউডার করতে পারে না।

নাইসিল—ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়।

১। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া নিবারণ করে। ২। ঘাম শুষে নেয়।
৩। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু নষ্ট করে। ৪। ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।

স্বাস্থ্যের উৎস

গ্ল্যাক্সো

HTB-GLL/8806

আনন্দমেলা

০৩ শ্রাবণ ১৩৯১ □ ৮ আগস্ট ১৯৮৪ □ ১০ বর্ষ ৩ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
লটারির টিকিট । বিমল কর ৩৪
কবিতা ও ছড়া
বুদিন্দর সিং । বিষ্ণু দে ৮
ভুতোর জুতো । অভীক বসু ২৩
রবিবারের গল্প । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৫৭
বনভোজ । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮
সত্যি-বিপদের কাহিনী
বিমানদস্যুদের কবলে । শেখর বসু ১৮
গল্প
বাঘের বাচ্চা । আবদুল জব্বার ৪
গোয়েন্দা অশ্বিনীমামা । কল্যাণ সেন ৯
তপেশবাবুর বিপদ । মীরা বালসুব্রমনিয়ন ২৬
নীল-সবুজের রাজ্যে । চিত্রা ঘোষ ৫৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩
ইতিহাসের গল্প
নানারকম নানাসাহেব । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ১৬
স্মৃতিকথা ।
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫৬
শার্লক হোমসের গল্পমালা
বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫১
বিজ্ঞানবিচিত্রা
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১১
খেলাধুলো
ক্রিকেটের পণ্ডিতমশাই । চুনী গোস্বামী ৬৩
লর্ডসের লর্ড গর্ডন গ্রিনিজ । অশোক রায় ৬৫
উইম্বলডনে ম্যাকেনরোর সংহারমূর্তি । সুব্রত সিংহ ৬৬
লেখাপড়া
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুল । জয়ন্ত ঘোষ ২২
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ২৩
বাংলা বলো । বাচস্পতি ২৫ ; সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ২৫
উচ্চ-মাধ্যমিকে ফার্স্ট রোশনি । অপরাজিতা ৫৭
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
টিনটিন ২০, টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৩২
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা, শব্দসন্ধান ২৯, মজার খেলা, উত্তর বটে
হাসিখুশি ৩০, তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : দেবাশিস দেব

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা ।

* আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী ?
* আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে ?
* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন ? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না ?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

বাঘের বাচ্চা

আবদুল জব্বার

চারদিকে মাকড়শার জালের মতন নদী। ধানি ঘাস সাঁতরাচ্ছে। করাতে-সাপ ভেসে চলেছে। ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপে দ্বীপে জঙ্গল। জঙ্গলভরা পাখি। বালিহাঁস, পান-পায়রা, কেঁদোচূড়া, শামুকখোল, মানিকজোড়, জলপিপি, ডাহুক, আগুনরঙের বক, কত কী পাখি, যেন হাজার-হাজার নারকেল ভাসছে। একটু শব্দ করলেই ফড়ফড় করে উড়তে থাকে পঙ্গপালের মতো আকাশ জুড়ে। তারপর অন্যদিকে নামে সব ঝুপঝুপ করে।

ধজি ঠেলে ঠেলে আহির কয়াল হিজল-গরান-সুঁদরির জঙ্গলের ভেতর জেলেডিঙি ঢুকিয়ে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল। ছাগলটা যাতে না ডাকে, তার জন্যে কচি ঘাস আর ভিজে ছোলা দেওয়া আছে। এক হাত লম্বা ফলাঅলা বর্শাটা ধরে সামনের ফণীমনসার জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে থাকে আহির। খইনি ডলে গালে ফেলে। গাছের ডালে ডিঙি বেঁধে রেখে যেই সে জলে নেমেছে, ছাগলটা একবার ডেকে উঠল। বোধহয় ভয়ে। তাড়া দিল। আশ্বাস দিল সে। দুপুরের সূর্য এখন জঙ্গলের মাথা ছেড়ে হেলে পড়েছে। বাঘিনী হয়তো বাচ্চা নিয়ে ঘুমোচ্ছে। রাতচরা জীব। রাতে শিকার করে, দিনে ঘুমোয়। বন্দনা-গান পড়তে পড়তে জঙ্গলের কিনারে উঠল আহির। হেলে-পড়া মনসা গাছে চক্ষু

ছবি : অনুপ রায়

মুদে শুয়ে-থাকা মেছো কুমিরগুলো হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে ঝুপ-ঝুপ করে জলে নেমে যায়। জঙ্গলে ঝোড়ো বাতাস ছুটেছে। সুঁদরির গজাল চারদিকে। ঝরাপাতা ছুটে যায় হু-হু করে। শব্দ ওঠে। এই শব্দের মধ্যেই ওঠে 'বরিশাল' ডাক—তোমাকে কেউ যেন নাম ধরে ডাকছে।

খানিকটা ভিতরে আসার পর ডাঁশ লাগল। সামনে একটা গোটা ঝাউগাছ জুড়ে ভিমরুলের চাক। গাছের ডালে মধুর চাক ঝুলে আছে। থালার আকারের বোলতার চাক। সুঁড়িপথে আরো খানিকটা এগোতেই পেয়ারাবানির জঙ্গলের মধ্যে আহির হঠাৎ দেখতে পেল, আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল! হাড়গোড়। পচা দুর্গন্ধ। আরও একটু এগোতেই দেখল ফাঁকামতো জায়গা। মানুষের সাড়া পেয়ে বনমোরগ-মুরগিরা দৌড়তে থাকে। গাছপালায় উঠে যায়। হঠাৎ আশমান-দোলা লতা ধরে হনুমান-বাঁদরের দল হুপহাপ কিচিরমিচির শব্দ তুলে দোল খায়, ছুটোছুটি করে। তাহলে কি বাঘ আসছে? বাঁদর-হনুমানরা তো মানুষের বন্ধু, মানুষকে সাবধান করে দেয়।

আহির পিছু হটল। ফিরে এল ডিঙিতে। চওড়া নদীর মাঝখানে ভেসে এল। ধনুকের গুলতি দিয়ে সাদা বড় কেঁদোচূড়া বক মেরে ছাড়িয়ে ফেলে মাংস কুচিয়ে স্টোভ জ্বেলে ভাত-মাংস একসঙ্গে রান্না করে খেল। ছোট জালার মধ্যে মিঠে জল আছে। মগভর্তি করে খেল পেট পুরে। তারপর শুয়ে পড়ল। শীতের হাওয়া আর রোদের আমেজে তন্দ্রা ধরেছিল চোখে। ঢেউ আছড়ে পড়ছে কেবলই জেলেডিঙির গায়ে। ছলাত ছলাত শব্দ। ছাগলটা চোখ বুজে দাড়ি নেড়ে নেড়ে আরামসে জাবর কাটছে। হঠাৎ বাঘের গলা-ঘড়ঘড়ানির শব্দে জেগে গেল আহির। জঙ্গলে ছায়া নেমেছে। দ্রুত ধজি ঠেলে নদীর মাঝ থেকে নোঙর তুলে অন্যপাশের বনের কিনারে আত্মগোপন করল সে। বাঘ তার নৌকো দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে।

হঠাৎ দেখল, বাঘিনী জলের কাছে নেমে এসেছে। পিছনে দুটো বাচ্চা। খেলা জুড়েছে তারা। বাঘিনী জিভ চকচকিয়ে জল খেতে লাগল। তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল। শেষে হঠাৎ জলে নেমে পড়তেই ভয়ে আহির বর্শাটা বাগিয়ে ধরল। না, বাঘিনী গা ধুচ্ছে। বাচ্চা দুটো জলের ধারে এসে ঢেউ দেখে পালাচ্ছে, আবার আসছে। নধর সুন্দর বাচ্চা। মাস চারেকের হবে। ছ'মাসের হয়ে গেলে আর ধরা যাবে না। কামড়াবে। তখন ওরা ছোটখাটো শিকার ধরে খেতে শিখে যাবে। মায়ের দুধ শুকিয়ে যাবে। বাঘ এসে হাজির হবে। আর বাপের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে লায়েক বাচ্চা দুটো আত্মগোপন করতে করতে এক সময় অন্য কোথাও কেটে পড়বে।

বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে উঠে চলে গেল।

আহির নদীর মাঝখানে চলে এল আবার।

সন্ধ্যা নামছে। পাখিরা জল ছেড়ে সারাদিনের আহার শেষ করে গাছে গাছে উঠে যাচ্ছে।

একপ্রহর রাত পর্যন্ত কেবলই জঙ্গলজোড়া পাখির কলরব।

আতঙ্কে কোনো সময় ঘুমোতে পারে না আহির। মাত্র চার হাজার টাকার জন্যে বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে সে। পশুর জীবন।

বাড়ির কথা মনে পড়ে আহিরের। তার বউ নেবুলা বলেছিল, 'এ কাজ তুমি ছাড়ো। জানে মরবে।' তাছাড়া বাবা বলত, 'বাঘের চৌহদ্দি একশো মাইল পর্যন্ত। রাতে রাতে বাঘিনী তার বাচ্চার খোঁজে এগোবে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসবে। বারো বছর ধরে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে লোকালয়ে পড়ে জীবজন্তু মারবে—নিজেও মরবে। যদি ঠিক নিশানা খুঁজে পায় তো আমাদের বাচ্চাও নিয়ে পালাবে। আমাদেরও জানে মেরে রেখে যাবে।'

নেবুলা বলে ভাল, কিন্তু জীবনটা চলে কী করে?

বাপ, ঠাকুরদাদা, পরদাদা সবাই তো বাঘের পেটে গেছে, সেও যাবে একদিন, এতে আর আশ্চর্য কী!

আসামের জঙ্গলে সে বাচ্চা-গণ্ডারের গুঁতো খেয়ে একমাস হাসপাতালে পড়ে ছিল। পাইথন জড়িয়ে পিষেছিল তাকে, যদি কাঠ ভাঙতে গিয়ে একটা পাহাড়ি মেয়ে না কাস্তে ছুঁড়ে দিয়ে সাহায্য করত, মারা যেত সে।

মরণ অত সহজে হয়ে যাবে ? তার বাপটা কি সব মিথ্যে মন্তর পড়ে জঙ্গল-বন্দনা করে বাউলি-সর্দার হয়ে কাঠুরে আর মউলেদের সঙ্গে গিয়ে প্রাণ হারাল এই জঙ্গলে ! তাহলে ঐ নরকঙ্কালটা কি তার বাপেরই ? কার্তিক মাসে এসেছিল তার বাপ। তখনই বাঘিনীর মা হবার সময়। মানুষের মিষ্টি মাংসে পেট ভরিয়ে তেজী হয়ে এখন বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।

তিন দিন তিন রাত কেটে গেল, বাঘের বাচ্চা ধরার কোনো কূল-কিনারা করতে পারল না আহির। কান্না পায় তার। কেবলই প্রাণের ভয়। মনে হয় জীবনটা তার শেষ হয়ে যাবে। আর একটা দিন কি দুটো দিন।...

নদীর ওপরের ঝুলন্ত ডালের মধুর চাকে আস্তে আস্তে ধজিটা গুঁজে দিলে হুড়হুড় করে মধু নেমে আসে। ধজির তলায় কলসী পেতে দেয় আহির। এক গ্লাস খাঁটি মধু খেয়ে নেয়। বেশি খেয়ে রোদে বেরুলে আবার গা জ্বালা করে !

শীতকালে জল-জাঙালের জল কমে যেতে চাষিরা হোগ্‌লা, কাঠশোলা, শরখড়ি কেটে নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শাল্‌তি ঠেলে আসে মেয়েরা হেতাল, খেজুর আর গোলপাতা কেটে নিয়ে যেতে। খেজুর-হেতাল পাতায় ঝাড়ু-চাটাই বানায় আর গোলপাতায় ঘর ছায়। জঙ্গল ঝেঁটিয়ে হাঁস-মুরগির ডিম কুড়োতে আসে কার্তিক মাসের দিকে। তখন দক্ষিণ মহাসাগর থেকে আসে কালো রাজহাঁস সোঁদরবনে ডিম পেড়ে বাচ্চা তুলে নিয়ে যেতে।

মউলে-কাঠুরের দল আসে। আসে ডাকাত। চওড়া মাতলা নদী দিয়ে বার-সমুদ্রে শুক্‌টি মারতে যায় জেলেদের বহর। কাঠুরেরা কাঠ সংগ্রহ করতে এসে নিয়ে যায় প্রচুর নারকেল, সুপুরি।

মারমার কাটকাট শব্দে সমুদ্র ডাকছে দক্ষিণের দিকে।

আহির ভাবে, তাকে যদি বাঘেই খায় তবে তার স্ত্রী নেবুলার কাছে রেখে যাচ্ছে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটা বড় হয়ে গেছে। কিছু কিছু রোজগারও করে। মরার পর বাপ তাকে যেমন একখানা খড়ের ছাওয়া ভুঁইকুঁড়ে দিয়ে গেছে, সেও তাই দিয়ে যাচ্ছে ছেলেদের।

ঝড়খালি, ধনেখালি, কইখালির জঙ্গলে জীবিকা সংগ্রহ করতে এসে কত মানুষের বেঘোরে প্রাণ গেছে, লাল নিশান পোঁতা আছে।

কত লোক তাকে জানে। জানে, ওর প্রাণে কোনো দয়ামায়া নেই।

আজ যা থাকে কপালে, সন্ধ্যার মুখে জঙ্গলে উঠবেই আহির কয়াল। ছাগলটা পোষ মানা হয়ে গেছে যেন হরদম গরান, সুঁদরি, গর্জনবানি, পেয়ারাবানির কচি কচি পাতা খেতে পেয়ে।

জঙ্গলে ছায়া নেমে যেতেই জেলেডিঙি বেয়ে ওদিকের দ্বীপে ছাগল নিয়ে গিয়ে উঠল আহির। ছাগলটাকে বুকে করে তুলে নিয়ে গেল। আঙুলের মতন মোটা সবুজ নাইলনের দড়িতে বাঁধা ছাগলটাকে হিজল গাছের মূলে বেঁধে রেখে ডালপালা ভেঙে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে এল। হাতে তার বর্শা। ছাগলটা একা হতেই ডাকতে লাগল। ডাকুক গে।

অন্যদিকে চলে এল আহির। যে দ্বীপে বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে আছে সেই দ্বীপে উঠল সে। বুক তার কাঁপছে। পাতার খস্‌খস শব্দ ঝোড়ো বাতাসে শোনা যায় না। আরও কাছে গেল সে। সেই কঙ্কালটা সুঁড়িপথে পড়ে আছে। হয়তো তার বাপের কঙ্কাল নয়। তারই মতন কেউ বাঘের বাচ্চা নিতে এসে মরেছে। আর এগোনো ঠিক হবে না। বড় একটা হাওয়াই গাছের ওপরে উঠে পড়ল আহির। বর্শাটা ওপরে তুলে এনে রেখেছে। তাছাড়া আছে কোমরে ঝোলানো খঞ্জর। আছে ব্যাগের মধ্যে তিন সেলের টর্চ। পরনে সবুজ গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট। গাছের মাথায় তে-ফ্যাঁকড়া জায়গায় জুত হয়ে বসে আহির। কাঠবিড়ালীরা চিক্কুর দিয়ে ছুটোছুটি করে। বাঁদর-হনুমানগুলো লাফালাফি আর চিৎকার জোড়ে। তাদের এলোমেলো ছুটোছুটি দেখে আহির শক্ত হয়। বাঘিনী কি তাহলে বেরিয়েছিল, দূর থেকে ফিরে আসছে, নাকি আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসছে ? এখনও কিছু আলো আছে। হঠাৎ দুটো বুনোশুয়োরকে ছুটে পালাতে দেখল। একদল হরিণ জল সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে।

পাখিরা উড়তে শুরু করেছে।

গোলপাতার বনে ঢেউ তুলে ঝোড়ো বাতাস বইছে।

হঠাৎ বাঘের গলা-ঘড়ঘড়ানি শুনতে পেল আহির। একেবারে কাছেই, গাছের নীচের ফাঁকামতন জায়গাটাতে। বাচ্চা দুটো সঙ্গে আছে। জিভ দিয়ে বাচ্চাদের মাথা চাটতে লাগল বাঘিনীটা। আড়মোড়া ভাঙল লম্বা হয়ে। হঠাৎ একটা খরগোশ ছুটে যেতে বাঘিনীটা ছুটল তার পিছনে। বাচ্চা দুটো কামড়াকামড়ি করছে এখন। নামতে গিয়ে নামল না আহির। না, এখন নয়।

কিছুক্ষণ পরেই বাঘিনীটা খরখোশ মেরে নিয়ে ফিরল। ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে লাগল।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে গেল।

কী ভয়ঙ্কর জঙ্গল ! আহির ভাবল, সে এখন মানুষ নয়। বুনো জানোয়ার। নাহলে এমনভাবে কেউ এই রাতকালে জঙ্গলের মাথায় বসে থাকে ?

তার বউটা এতক্ষণে রান্না বসিয়েছে। ছেলেমেয়েরা তার পাশে বসে বলছে, "মা, বাপ কবে আসবে ?"

চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল আহিরের। যদি তার ধনসম্পত্তি থাকত তাহলে এমন করে জঙ্গলে বাঘের বাচ্চা চুরি করতে আসতে হত না তাকে।

এক প্রহর রাত কেটে গেল। পাতকোয়া পাখি ডেকে উঠল।

প্যাঁচা ডাকতে লাগল। গোসাপ ডাকছে ফটাফট ফটাফট শব্দ তুলে। জঙ্গল-জোড়া ঝিঁঝির ডাক।

ছাগলটার ডাক শোনা যাচ্ছে এখনও।

হা-লু-ম শব্দে ডেকে উঠল হঠাৎ বাঘিনীটা খানিকটা দূরে। ওদিকে নদীর ধারে নিশ্চয়। কান পেতে রইল আহির। মুহূর্ত গুনছে সে এখন। নদী পার হচ্ছে এতক্ষণে বাঘিনীটা।

হঠাৎ ছাগলের বিকট ভ্যাবানি !

বাঘ ধরেছে তাকে। দড়িতে টান পড়েছে। ঝুলোঝুলি করছে। ভাবতে ভাবতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মাটিতে নেমে

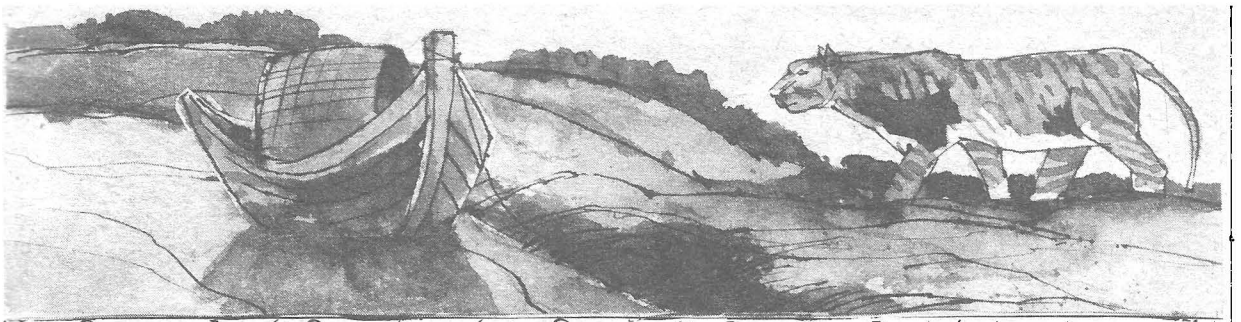

এল আহির। ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বর্শা হাতে নিয়ে টর্চের আলো ফেলে ফেলে এগোতে গিয়েই তার মনে হল যদি বাঘিনীটা থাকে, বাঘটাই শিকার ধরে ? শয়তান, শয়তান লেগেছে তার পিছনে। সে আর দাঁড়াল না। দশ মিনিটের মধ্যেই যদি সে কাজ হাসিল করতে না পারে তো জীবন চলে যাবে। ভাবার সময় নেই আর। হয় মৃত্যু না হয় জয়।

সুঁড়িপথে দ্রুত ছুটল আহির। সামনে আলো। আঁকাবাঁকা পথ। মাঝে-মাঝে গুড়ি মেরে মেরে যেতে হয়। কাঁটায় গা-হাত ছিঁড়ে যায়। রক্ত ঝরে। এখন সেসবে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ফণীমনসার জঙ্গল পার হয়ে সে গোলপাতা শর-খড়ির বনের মধ্যে এসে হঠাৎ যেন ধাঁধায় পড়ল। দুদিকে পথ। নাটা-কাঁটার জঙ্গল। হুমড়ি খেয়ে গলে গলে এগিয়ে এসে বাঘের আশ্রয় পেয়ে গেল আহির। বাচ্চা দুটো কই ? ওই তো শুয়ে আছে শুকনো পাতার ওপরে। তাড়াতাড়ি দুটোর ঘাড় ধরে তুলে নিতেই ফ্যাঁ ফোঁ শব্দে গর্জাতে থাকে। ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলে মুখটা বেঁধে নিয়ে কোমরে বেঁধেই ছুটতে ছুটতে ফিরতে লাগল আহির। সে খুব হাঁপাচ্ছে। মনে হল একটু কিচ্ছুতে ধাক্কা লাগলে সে যদি পড়ে যায় তো আর উঠতে পারবে না। বাঘিনী কি ফিরে আসছে ? নদী পার হচ্ছে এতক্ষণ ? বর্শাটা বাগিয়ে ধরে একহাতে টর্চের আলো ফেলে দ্রুত ছুটল আহির। গজালে আঘাত খেল। ছিঁড়ে গেল মাংস। রক্ত ঝরছে। বাচ্চা দুটো আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে ব্যাগ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে। অবশেষে সে নদীর ধারে এসে পড়ল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নৌকোটা কই ? ঐ তো ! বাচ্চা দুটোকে নৌকোর খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দ্রুত উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন এখুনি তার ওপরে বাঘিনীটা ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাড়াতাড়ি দড়ির বাঁধন খুলে জেলেডিঙিটাকে নদীর মাঝখানে আনতে লাগল ধজি ঠেলে ঠেলে।

নদীর মাঝখানে এসে আনন্দে সে চিৎকার করে উঠল। ধজি ফেলে রেখে আনন্দে সে পাগলের মতো মাথা কুটতে লাগল। হা-হা করে হাসতে লাগল। তার শরীরের কত জায়গায় কাঁটা ফুটেছে, কেটে গেছে, এখন তা জ্বালা করে জানান দিচ্ছে। টর্চের আলো ফেলে দেখল, বাঘের বাচ্চা দুটো কেবলই কুঁদোকুঁদি করছে। কাঁদছে। চেঁচাচ্ছে। ব্যাগটা আলগা করে মুখের কাছে বাঁধে আহির। হঠাৎ বাঘিনীর বিকট চিৎকার শোনা যায় তীরে, হা-লু-ম !

টর্চ মারে আহির। মাটি আঁচড়াচ্ছে বাঘিনীটা। হঠাৎ বিকট গর্জন করতে করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উন্মত্তের মতো জেলেডিঙি ছোটাল আহির। মরিয়া হয়ে আঁকাবাঁকা নদীপথে সে ছুটতে লাগল। কেবলই তার মনে হতে লাগল বাঘিনীটা এক্ষুনি নদী পার হয়ে তীরে উঠে ছুটতে ছুটতে এসে তার ওপরে লাফ দিয়ে পড়বে। নিশাচর প্রাণী, ওদের চোখ জ্বলে, হয়তো তাকে চিনেও ফেলেছে।

ঘণ্টাখানেক ধজি ঠেলার পর অন্ধকারে কোথায় এল কিছু বুঝতে না পেরে ভাবতে লাগল 'নিশি'তে তাকে ঘোরাচ্ছে না তো ? তাহলে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, আবার সে সেখানেই এসে পৌঁছবে। তখন বাঘিনীর হাতে তার মৃত্যু অনিবার্য।

মাঝরাতের দিকে সে যখন গোসাবাঘাটের দু-একটা আলো দেখতে পেল, তখন যেন তার ধড়ে জান ফিরে এল।

সে এখন ক্লান্ত, অবসন্ন।...

ভোরবেলা সে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি খালের জলে ডিঙি বেঁধে রেখে বর্শা আর বাঘের বাচ্চা দুটোকে নিয়ে এসে স্ত্রীকে ডাকল, "নেবুলা, ওঠ্ তাড়াতাড়ি, মরে গেছি রে আমি !"

"কী হল গো ! কী হয়েছে তোমার ?" ছুটে বেরিয়ে এল নেবুলা।

তার হাতে বাঘের বাচ্চার ঝোলাটা দিয়ে আহির বলল, "এই নাও, দু'হাজার টাকার মাল। দু'হাজার নেওয়া আছে, আর দু'হাজার পাব।"

"বাঘের বাচ্চা !"

"হ্যাঁ। কাঁটা-খোঁচায় আমার গা-হাত কেটে নাস্তানাবুদ। গরম জল করে আগে আমার গা ধোয়া। তারপর অন্য কথা।"

বাঘের বাচ্চা দুটোকে তারের ঘের-দেওয়া বকের খোঁয়াড়ের মধ্যে ছেড়ে দিল আহির। তার ছেলেমেয়েরা দেখতে লাগল। বক দুটোও দেখছে।

দু-দিন পরেই কলকাতা শহর থেকে এল অর্জুন রক্ষিত। ফুটো-করা বাক্সর ভেতরে পুরে লোক দিয়ে মাথায় করে বয়ে নিয়ে বাচ্চা দুটোকে সে শহরে নিয়ে গেল। তারপর ব্যবসাদার দুলাল আঢ্যি গোপনে কোথায় কোন্ দেশে যে চালান করে দিল, সেই জানে !

সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চা হয়তো আমেরিকার চিড়িয়াখানায় দেখা যাবে—নয়তো বা সুইডেনে, কিম্বা অস্ট্রেলিয়ায়।

কিন্তু রাত্তিরে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে বেরুতে পারে না আহিরের বউ নেবুলা। তার ধারণা, গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদিন বাঘিনীটা আসবেই আর তার সন্তানদের নিয়ে পালাবে।

আহির সে-কথায় কেবল হাসে হা-হা করে পাগলের মতন। তার হাসি দেখে পিত্ত জ্বলে যায় নেবুলার। বলে, "তুমি তো একটা চোর, মায়ের কোল থেকে বাচ্চা চুরি করো, তুমি কি মানুষ ?"

বুদিন্দর সিং

বিষ্ণু দে

বুদিন্দর সিং বাঁধেলি
ভীষণ কথা কয় খালি,
চেঁচামেচি হাটের গোল,
ঢোক-ঢাল আর ঢাক-ঢোল।
মুখেই মারে হালুম হুমো,
ঘুম না পেলেও বলে—ঘুমো।
মুঙ্গেরে সে করছে যে কী,
দিনরাত তার ছবি দেখি।
ছোটদাদু কি বুদুকে নিয়ে
কুমির মারেন গঙ্গা গিয়ে,
জঙ্গলে কি মারবেন শের,
বাইসন কি মারলেন ফের।
বুদিন্দন মৌগ্‌লি টুমাই
মারল গুড়ুম পটাস ধাই।
মেরেই নাকি পনাম করে
ছোটদিদাদের চরণ ধরে।
এ-সব ভেবে ভীষণ ভিতু
দাদনদার কী কাতুকুতু।

২৯।১০।৬৪

স্বর্গত কবি বিষ্ণু দে এই ছড়াটি লিখেছিলেন বুদুভাইকে নিয়ে। বুদুভাই তাঁর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের ডাকনাম। ভাল নাম আহিতাগ্নি চক্রবর্তী। আহিতাগ্নি যখন খুব ছোট, তখন রিখিয়ায় সে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বাড়িতে গিয়েছিল দুর্গাপুজা দেখতে। আহিতাগ্নির মুখে তখনও ভাল করে কথা ফোটেনি। তাই, ঢাক-ঢোল বাজাবার ইচ্ছে হওয়ায় সে বলে ফেলেছিল, "ঢোক-ঢাল বাজাব!"

ছবি : অনুপ রায়

গোয়েন্দা অশ্বিনীমামা

কল্যাণ সেন

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি একটা পেনসিল কাটছিলাম, দু-তিনটে চড়ুই রোদের ভেতর নাচানাচি করছিল করবী গাছটার পাশে, ঠিক সেই সময় একটা সাইকেল রিকশা এসে থামল গেটের সামনে। রিকশা থেকে নামলেন অশ্বিনীমামা। অশ্বিনীমামার হাতে পেল্লাই এক স্যুটকেস, কাঁধে খয়েরি রঙের চমৎকার একটা ঝোলা-ব্যাগ। মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, বারান্দায় উঠেই টিপ করে মাকে একটা প্রণাম করে বললেন মামা, "ট্রেন তিনঘণ্টা লেট মেজদি, জলদি চা বানাও, অন্য কথা সব পরে।"

আমিও এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম মামাকে। অদ্ভুত একটা শব্দ শুধু বার হল মামার মুখ থেকে, বুঝলাম না, সেটা মামার নতুন শেখা কোনো সাংকেতিক ভাষাটাষা কিনা ; তারপর মামা ঢুকে গেলেন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে।

প্রায় প্রত্যেক বছরই শীতের সময় অশ্বিনীমামা একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসেন। তখন খুব মজা হয় আমাদের। মা কত কী খাবারটাবার বানায় মামার জন্য, বাবাও হয়তো হঠাৎ একদিন অফিসে না গিয়ে বলেন—"চলো হে, অশ্বিনী দি গ্রেট. বড় ঝিলে মাছ ধরে আসি।"

দুপুরবেলা ঘুমোন না মামা। ইজিচেয়ারে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে কত কী যে গল্প বলেন তখন, ইস্তাম্বুলের বুড়ো শয়তান আর কঙ্গোর জংলি সর্দারকে কী রকম ঘোল খাইয়েছিলেন, কীভাবে একবার এক প্লেন-হাইজ্যাকারকে সেরেফ নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে ফেলে ··· (কত যে গল্পের স্টক আছে মামার।) মঞ্জুদি তখন মামার মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দেয়। ঘন ঘন ইন্‌হেলার শোঁকেন মামা, কৌটো বার করে যোয়ান মুখে দেন।

"সেই তিব্বতি সোনার আশ্চর্য প্রদীপটার গল্প শেষ করলেন না মামা ?" মঞ্জুদি চুল তোলা বন্ধ করে এভাবে উসকে দিতে চায় মামাকে।

"ধ্যুস ! ওটা আবার একটা গল্প ! তার চেয়ে শোন, এবার গোয়ায় গিয়ে যা একখানা কাণ্ড দেখে এসেছি না ! শুনলে একেবারে স্পিকটি নট হয়ে যাবে তোদের !"

"কী, কী গল্প, বলুন না মামা !" আমরা দুজনেই একসঙ্গে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ি।

"চলন্ত হাত, একখানা চলন্ত হাত ··· বুঝলি ?"

"দারুণ তো !"

ছবি : অনুপ রায়

কিন্তু কিছুতেই গল্পটা শুরু করেন না মামা, ঘন ঘন ইনহেলার শোঁকেন চোখ বন্ধ করে। তারপর হঠাৎ একসময় টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে নিয়ে বলেন, "তিনটে বেজে সাতাশ, মঞ্জু, কুইক, চায়ের জল চাপাতে বলো মেজদিকে ; চলন্ত হাতের গল্পটা আর ··· ।"

শীত এখনো তেমন জাঁকিয়ে পড়েনি, তবু চা-টা খেয়ে বেড়াতে বেরোবার সময় দুটো গেঞ্জির ওপর সোয়েটার, তার ওপর জামা, জামার ওপর কোট নীল রঙের, যেন পর্বত অভিযাত্রীর ফোটো একখানা, মুখে যোয়ান, হাতে ছোট্ট নোটবই, অশ্বিনীমামা রেডি। ··· একটু এগোতেই মামা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান ; চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকান ডাইনে বাঁয়ে।

"বাপতু, লাইটপোস্টের পাশ থেকে ছায়ার মতন কী যেন একটা সরে গেল না সাঁত্ করে ?"

"কই, আমি তো কিছু দেখিনি।" অবাক হয়ে উত্তর দিই আমি।

"ওভারব্রিজের মুখ থেকে নীল জামা গায়ে একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেমন চলে গেল, তাও দেখিসনি ?"

"ও তো গণপত, স্টেশনের বুড়ো ঝাড়ুদার।"

"ধ্যাত্ ! গবেট একটা। লোকটা ছদ্মবেশ নিয়েছে নির্ঘাত, বোধহয় বাড়ির কাছ থেকেই ফলো করছিল আমাদের ; রহস্য ··· ইয়েস, দেয়ার ইজ এ বিগ রহস্য ! সাবধান বাপতু, যে পথে এসেছি আমরা, কিছুতেই ফেরা চলবে না সে পথে !"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখ ব্রাশ করছি, দেখতে পেলাম, বাগানের করবী গাছটার পাশ দিয়ে হাতে একটুকরো কাগজ, অশ্বিনীমামা হনহনিয়ে এগিয়ে আসছেন আমার দিকেই।

"বাপতু, খুব সাংঘাতিক ব্যাপার !"

"কেন, কী হয়েছে মামা ?"

"নে, এটা দেখ।" মামা কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

হাতে নিয়ে দেখলাম, বোধহয় ছেঁড়া ঠোঙা-টোঙা হবে কিছু, কেমন তেজপাতা-তেজপাতা গন্ধ, কাল নিশ্চয়ই এটায় করে বাজার থেকে তেজপাতা এনেছিল ভজনলাল। সেটাই পড়েছিল বাগানের কোথাও। "এ তো মনে হচ্ছে মামা, ছেঁড়া ঠোঙা একটা, এতে সাংঘাতিক আবার কী আছে ?"

"ঘটে কিছু থাকলে বুঝতিস ! এটা মোটেই কোনো অর্ডিনারি কাগজ নয়।"

"তবে ?" এবার সত্যিই আমার গলায় বিস্ময় ফুটে ওঠে।

"উড়ো চিঠি একটা, লেখা হয়েছে অদৃশ্য কালিতে। বুঝলে গজমূর্খ।"

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অন্যরকম গলায় মামা বলে ওঠেন, "বিপদ প্রায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে রে ! মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে এখন এগোতে হবে আমাদের।" কথা বলতে বলতেই ঝোলা থেকে একটা সবুজ দড়ি বার করলেন মামা, দু-মাথাঅলা একটা ছুরি, চমৎকার পেনসিল-টর্চ একটা ; নোটবুকে কী যেন লিখলেন। তাড়াতাড়ি, দেয়ালে ছুঁড়ে মারলেন টর্চের সরু আলো, হঠাৎ পায়চারি শুরু করে বললেন, "খানিকটা গন্ধক যোগাড় করতে পারিস বাপতু ?"

"গন্ধক ? কোথায় পাব ?"

"হোপ্‌লেস একেবারে !" ইনহেলার শুঁকতে শুঁকতে মামা আমাকে প্রায় ধমকে ওঠেন। আমি তাকিয়ে দেখতে থাকি সব ; জানলার দিক থেকে দড়ি দিয়ে কী যেন মাপেন মামা, নোটবই বার করে কী সব পড়তে পড়তে বলে ওঠেন, "উনিশ আর সতেরো দুটো সংখ্যা গুণ, না পাশাপাশি রাখা গেলে ··· টেলিগ্রামে তাহলে ভুল খবরটাই ··· ।"

হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি, কিছুই বুঝতে পারি না। আবার ফিস্‌ফিস করে মামার গলা। "একটা ছায়ার সাঁত করে সরে যাওয়া, ওভারব্রিজের মুখের সেই ছদ্মবেশী নীল জামা, ভ্যানিশিং ইঙ্কের চিঠির টুকরো ··· মিলে যাচ্ছে, ইয়েস, পরপর সব মিলে যাচ্ছে ! এখন দরকার শুধু মেজর খান্নার মোজার টুকরোটা খুঁজে পাওয়া ···ব্যস্ ! তাহলেই ঘচাং ক্যাচ !" মামা ঘরের মধ্যে প্রায় ঘুরপাক খেয়ে নিলেন একবার, তবে সেটা আনন্দে না উত্তেজনায়, ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।

"বাপতু, নবাব-বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে একটা ছোট গেট আছে না ?"

"আছে বোধহয়, আমি ঠিক ··· ।"

"আজ কখন চাঁদ উঠবে বলতে পারিস ?"

"না তো ! জিজ্ঞেস করে আসব মাকে ?"

"ন্না ! কিস্‌সু হবে না দেখছি তোকে দিয়ে।" ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে মামা পকেট থেকে যোয়ান বার করে মুখে দেন।

বাইরে চাঁদের কেমন ময়লা-ময়লা আলো, জামরুলরঙ সেই জ্যোৎস্নায় বাড়ি, গাছ, মাঠ সব এখন অন্যরকম। হাওয়ায় বেশ শীতের টান, অশ্বিনীমামা কোটের ওপরও চাপিয়েছেন খয়েরি মোটা চাদর, মাথায় কান-ঢাকা টুপি, দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন মামা নয়, হেঁটে যাচ্ছে মামার ভূত। আমি হাসতে গিয়েও জোর করে চেপে রাখলাম হাসি।

"বাপতু, গন্ধ পাচ্ছিস কিছু ?"

"হ্যাঁ, রঞ্জুদের বাড়িতে গাছ আছে শিউলিফুলের, এখনো ফুল ফুটছে গাছগুলোয়, সেই শিউলিফুলেরই গন্ধ মামা।"

"ফুলের গন্ধটন্ধ নয়, কেমন মিষ্টি-মিষ্টি একটা গন্ধ, পাচ্ছিস না ?"

"কই না তো !"

রাস্তা দিয়ে বোধহয় ছুটে পালাল বড় বড় কয়েকটা মেঠো ইঁদুর, ঘুম-ভাঙা পাখি বিশ্রী ডেকে উঠল হঠাৎ কোনো গাছের আড়ালে ; কেমন ভয়-ভয় করছে আমার। মামার ছায়াটাও কেমন তেরছা হয়ে ··· কোথাও বেড়াল ঝগড়া করছে নাকি ?

"বাপতু, এসে গেছি আমরা, খুব হুঁশিয়ার !" কানের কাছে মামার গলায় ফিসফিস। লক্ষ করলাম নবাববাড়ির চেহারাটা এখান থেকে জ্যোৎস্নায় কেমন ঝাপসা, যেন অনেক পুরনো কোনো ছবি। লোহার বেঁটে জংধরা গেটটায় চাঁদের ঘোলাটে আলো কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে যেন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তবু মামা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেললেন কয়েকবার।

"আমি আগে ভেতরে ঢুকে তিনবার টর্চের আলো ফেললে তুই ভেতরে ঢুকবি, কেমন ?"

"কিন্তু মামা ··· ।"

"কী হল আবার ?"

"ভেতরে তো বেশ জঙ্গলটঙ্গল হয়ে আছে, যদি কিছু মানে

শেয়ালটেয়াল থেকে থাকে ? যদি হঠাৎ তেড়ে এসে আমাদের কামড়ে দেয় ? তখন ?"

আমার কথায় ঘুরে দাঁড়ালেন মামা, "শেয়াল ? য়্যু মিন ফক্স ? ভেরি ডেঞ্জারাস ··· ।" মামার নাক কুঁচকে যায়, তারপর বেশ মেজাজের সঙ্গে বলেন, "আচ্ছা বাপতু, তুই কখনো পড়েছিস বা শুনেছিস, কোনো ডিটেকটিভকে শেয়ালে কামড়েছে ?"

"কিন্তু শেয়ালরা বুঝবে কী করে যে আপনি ডিটেকটিভ ?"

"ঠিক কথা তো ! কিন্তু মেজর খান্নার মোজার টুকরোটা যে চাই-ই আমার ।"

"কাল দিনের বেলা এসে একবার দেখলে হয় না ?"

"দিনের বেলা কোনো রহস্য থাকে ? গবেট কোথাকার !"

"তাহলে ?" মামার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলি আমি ।

"কুছ পরোয়া নেহি । আয়, দুজন একসঙ্গে ভেতরে ঢুকি, এখানেই রহস্যের আসল জট, বুঝলি ? কাম অন ··· কুইক।" বেঁটে গেট টপকে মামা একদম বাগানে ।

আমিও লাফ দিয়ে পড়লাম ভেতরে । চাঁদের আলো থাকলেও জায়গাটায় যেন অন্ধকারেরই রাজত্ব । খানিকটা ফাঁকা ঘেসো জমি পেরিয়ে একটা উঁচু বেদিমতন জায়গায় উঠে যেই মামা পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজিয়েছেন, অমনি বিকট এক চিৎকার । গোঁ-গোঁ আওয়াজ, যেন দশটা ভূতের সঙ্গে রামযুদ্ধ লেগে গেছে মামার । ছুটে গিয়ে আমিও পকেট থেকে টর্চ বার করে আলো ফেলতেই সব পরিষ্কার । আরে ! এ তো দেখছি গোবিন্দ ! আমাদের স্কুলের সামনে ঝাল আচার, চাটনিটাটনি বিক্রি করত ।একটু পাগলা-পাগলা ছিল, কালী সাজত মাঝে-মাঝে । হঠাৎ একদিন দোকান-টোকান ফেলে হাওয়া । সেই পাগলা গোবিন্দই অন্ধকারে মামার গলা চেপে ধরতেই মামার গলা দিয়ে একদম বোম্বাই চিৎকার ।

"মামা, ও মামা !"

তিন মিনিট সাড়ে একুশ সেকেণ্ড চোখ বুজে পড়ে থাকার পর পিটপিট করে চোখ খুলে মামা বললেন, "বাপতু, আমরা শত্রুর হাতে বন্দী ; এখন উপায় ?"

"কিছু ভয় নেই, ও তো পাগলা গোবিন্দ, খুব চেনা লোক আমাদের, চলুন, এখন বাড়ি ফিরে চলুন ।" কী একটা শব্দ করলেন মামা মুখে, কোনো সাংকেতিক শব্দ বোধহয় ।

তিন জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে মামা আবার নোটবইয়ে কী যেন লিখছেন, আমি খাটে বসে পড়ছি পাগলা দাশু, মঞ্জুদি এমন সময় ঘরে ঢুকে আমার কানে মুখ লাগিয়ে বলল, "জানিস্, মামার সেই সোনা-রঙ সুন্দর সেফটি-রেজারটা পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, বোধহয় চুরি হয়ে গেছে ।"

"যাহ্ ! মামার মতন ডিটেকটিভের জিনিস চুরি করবে, এত সাহস কার ?"

"ছাই ! মামা একটা জি· এম· জি· আর· ।"

"মানে ?"

"গুল মহম্মদ গুলের রাজা ।" ঠিক তখন আবার গলা শোনা গেল মামার, "মঞ্জু, তিনটে বেজে সাতাশ, চায়ের জল চাপাতে বলো মেজদিকে । কুইক ।"

জেনে নাও

অরূপরতন ভট্টাচার্য

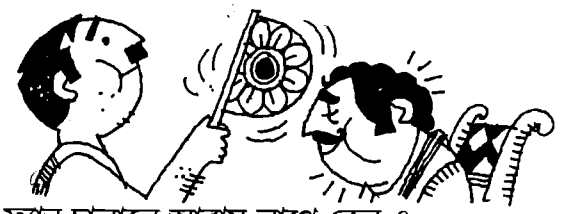

ফ্যান চালালে আরাম লাগে কেন ?

গরমের দিনে লোডশেডিংয়ের সময়ে ফ্যান ঘোরা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন যে কষ্ট হয়, তার হিসেব কে করে ? কিন্তু ঘেমে-নেয়ে একাকার । যেই কারেণ্ট আসে, পাখা ঘুরতে আরম্ভ করে, পাখার হাওয়ায় যে কী আরাম, তা বোঝা যায় । হাতপাখাতেও আরাম লাগে, সে আরামটুকু একেবারে হাত ঘুরোনোর ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে ।

তাহলে একটা কথা ঠিক যে, পাখা যে-রকমই হোক না কেন, পাখা ঘুরলেই আরাম লাগে । তখন আর ঘামতে হয় না ।

কিন্তু কেন ?

পাখা না ঘুরলেই গরমে কষ্ট, অথচ পাখা ঘুরলেই আরাম, স্বস্তি, গরম যেন আর তেমনভাবে বোধ হয় না ।

পাখার হাওয়ায় এমন কী জাদু আছে, যাতে শরীর জুড়িয়ে যায় ?

যাঁরা টাকা গোনেন, তাঁরা স্পঞ্জে জল দিয়ে মাঝে মাঝে আঙুল ভিজিয়ে নেন । কারণটা এই যে, স্পঞ্জ জল ধরে রাখে । স্পঞ্জ যেমন জল ধরে, তেমনি বাতাসও একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় হিসেবমতো জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে । কিন্তু এই জল আসবে কোথা থেকে ? স্পঞ্জে জল ঢালতে হয়, বাতাসে তো আর জল ঢালা যায় না ওরকম করে, সেখানে জল আসবে ভেজা জিনিসপত্র বা জলের আধার থেকে ।

জল থেকে বাষ্প, শুনে মনে হয় ব্যাপারটা এমন কিছু নয় । কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, অবস্থাটা বদলে যাচ্ছে । তরল হয়ে যাচ্ছে গ্যাস । আগে যা ছিল জল, এখন তা বাষ্প ।

কেটলির জল গরম করার সময়ে কী হয় ? প্রথমে জল গরম হতে আরম্ভ করে । ঠাণ্ডা জল আর ঠাণ্ডা থাকে না । উষ্ণতা বাড়ে, বাড়তেই থাকে । তারপর এক সময়ে জল ফোটে । মা গল্পের ঝোঁকে আঁচ থেকে কেটলি সরিয়ে নিতে ভুলে গেলে জল ফুটে-ফুটে বাষ্পই হয়ে যাবে । কেটলিতে আর কাপে ঢালার মতো কিছু থাকবে না ।

তাহলে এই যে জল থেকে বাষ্প হয়ে অবস্থাটা বদলে যাওয়া, এর জন্যে উত্তাপ দরকার ।

কেটলির জল গরম করার সময়ে যে-রকম, পাখা চালিয়ে শরীর শীতল করার বেলাতেও সে-রকম ।

পাখা যখন ঘোরে তখন কী হয় ?

তখন আমাদের শরীরের ঘাম যাচ্ছে উবে । আর একটু ভেঙে বলা যায়, ঘাম তরল, হয়ে যাচ্ছে গ্যাসীয় । অবস্থার বদল—এই বদল হওয়ার জন্যে তাপ দরকার । এই তাপ কোথায় পাওয়া যাবে ? সে-তাপের জোগান দিচ্ছে আমাদের শরীর । শরীর তখন রয়েছে উত্তপ্ত হয়ে । ফলে ঘাম যাচ্ছে বাষ্প হয়ে উবে আর তাপ যাচ্ছে বেরিয়ে । অর্থাৎ শরীর শীতল । সেই জন্যে পাখার হাওয়া ভাল তো লাগবেই ।

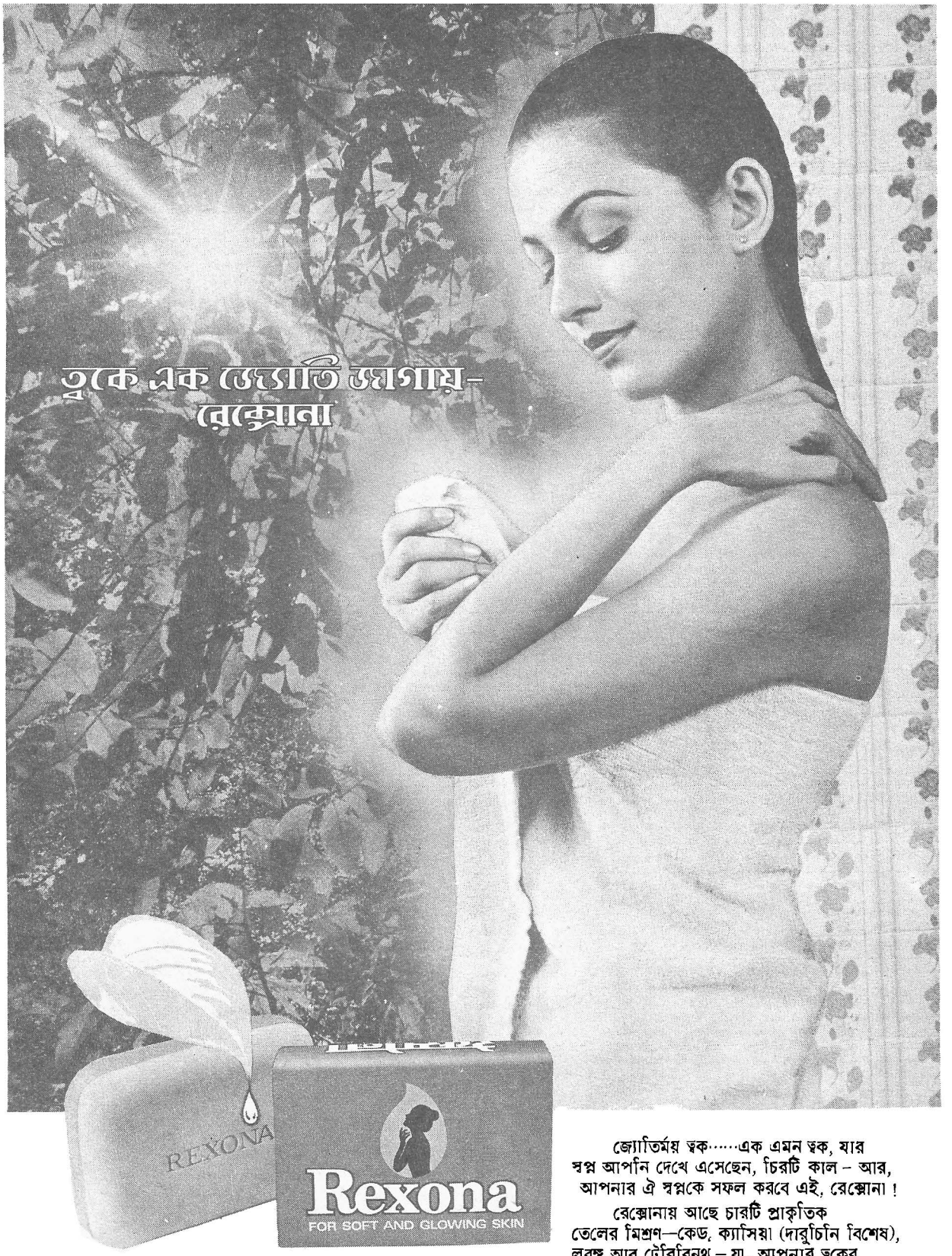

জ্যোতির্ময় ত্বক.....এক এমন ত্বক, যার স্বপ্ন আপনি দেখে এসেছেন, চিরটি কাল – আর, আপনার ঐ স্বপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোনা !

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ – যা, আপনার ত্বকের যত্ন নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে।

রেক্সোনা আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RX 84 2416 BG

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে তাদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে নানারকম ফলের বাগান করছিলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই মাঝরাতে কীজন্য যেন লেবুবাগানে এসেছিলেন, তারপর থেকেই তিনি উধাও। দিপু আর ইরানি এসে দেখল, সেই লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। লেবুবাগানটা বেশ বড়, ভেতরটা অন্ধকার। তার ভেতরে ঢুকে দেখা গেল সেখানে মুরশেদ নামে একজন পাগল শুয়ে আছে। তার কাছ থেকেও জ্যাঠামশাইয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। রহস্যের কোনো সমাধান করতে না পেরে দিপু একটা চিঠি লিখল সন্তুর কাকাবাবুকে। তারপর ...

বাইরে একটা সাইকেলের বেলের ক্রিংক্রিং শব্দ শোনা গেল। তারপর কে যেন হাঁক দিল, "কেষ্ট ? কেষ্ট আছিস নাকি ?"

কেষ্ট কাছাকাছি বোধহয় নেই, সে উত্তর দিল না। ইরানি নেমে এল বারান্দা দিয়ে।

পুলিশের পোশাক পরা একজন লোক সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। বেশ মোটাসোটা চেহারা, মাঝারি বয়েস। হরতনের গোলামের মতন পুরুষ্টু একখানা গোঁফে ঠোঁট প্রায় ঢাকা। লোকটির ভুরু দুটোও বেশ মোটা-মোটা।

ইরানিকে দেখে বেশ অবাক হয়ে সেই মোটা ভুরু দুটো ধনুকের মতন বাঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে গো ? তোমায় তো আগে দেখিনি ?"

ইরানি বলল, "এটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের ফার্ম। আমি আর আমার ভাই কলকাতা থেকে আজ দুপুরে এসেছি।"

এই সময় কেষ্ট রান্নাঘরের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "দারোগাবাবু এসেছেন ? বসুন, বসুন ! ওরে এককড়ি, একটা চেয়ার নিয়ে আয় !"

দিপু তার দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। এত কাছ থেকে কোনো পুলিশের লোককে সে আগে দেখেনি। দারোগাবাবুর চেহারা দেখে বেশ ভালমানুষ মনে হয়। দিপুর বড়মামার মুখখানা ঠিক এইরকম। তাদের পাড়ার দর্জি সন্দর আলির চেহারার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। বড়মামা আর সুন্দর আলি, দু'জনেই ভাল লোক। এইরকম লোক কি চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করতে পারে ?

দারোগাবাবু কেষ্টকে বললেন, "তোদের এখান থেকে নাকি একটা সাইকেল চুরি গেছে ? চালতাডাঙার হাটে তিনটে সাইকেল ধরা পড়েছে। থানায় গিয়ে দেখে আসিস তো তোদের সাইকেলটা ওর মধ্যে আছে নাকি ?"

এককড়ি একটা চেয়ার পেতে দিল দারোগাবাবুর জন্য। তারপর বলল, "আপনারা শুধু সাইকেল-চুরি-ই ধরতে পারেন। বড়বাবু যে কোথায় গেলেন, তার খোঁজ তো এখনও দিতে পারলেন না।"

দারোগাবাবু আবার অবাক হয়ে বললেন, "বড়বাবু ? কেন, তাঁর কী হয়েছে ?"

এবারে কেষ্ট মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আজ্ঞে, বড়বাবুকে যে কয়েকদিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরে উঠে একলা-একলা বাইরে বেরোলেন, তারপর থেকেই ..."

দারোগাবাবু বললেন, "সে কী ? উনি আবার কোথায় যাবেন ? কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ? আমায় কেউ খবর দেয়নি ?"

কেষ্ট বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি থানায় জানিয়ে এসেছি, আপনি তখন ছিলেন না।"

দারোগাবাবু বললেন, "এ বড় আশ্চর্যের কথা। অত বড় মানুষটা এমনি-এমনি যাবেন কোথায় ? হঠাৎ কলকাতায় চলে যাননি তো ?"

কেষ্ট ইরানির দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "এই তো বড়বাবুর

ভাইঝি এসেছে কলকাতা থেকে। এনারাও কোনো খবর জানেন না।"

দারোগাবাবু বললেন, "হয়তো কলকাতায় গেছেন অন্য কোনো কাজে। হোটেলে উঠেছেন।"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামশাই কলকাতায় গেলে প্রথমে আমাদের বাড়িতেই আসেন। হোটেলে উঠবেন কেন?"

এককড়ি বিদ্রূপের সুরে বলল, "যত সব উল্টোপাল্টা কথা! বড়বাবু রাতদুপুরে কলকাতায় যাবেন কি উড়োজাহাজে? সে সময়ে কি কোনো বাস আছে না ট্রেন আছে? হুঁঃ!"

হঠাৎ দিপুর মনে হল, এই এককড়ি নামের লোকটি বোধহয় কিছু জানে। সব কথা সে খুলে বলছে না। লোকটির সাহসও আছে, নইলে দারোগাবাবুর সামনে এরকমভাবে কথা বলতে পারে?

দারোগাবাবু এককড়ির কথা গায়ে মাখলেন না। কেষ্টর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো চিঠি-ফিঠি লিখে যাননি? তোকে সেদিন এমন কোনো কথাও বলেননি যে, হঠাৎ কোথাও যেতে হতে পারে?"

কেষ্ট বলল, "সেদিন তো বড়বাবুর পায়ে চোট লেগেছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। রাত্তিরে শুয়ে পড়েছিলেন তাড়াতাড়ি।"

"তোদের একটাই তো মোটে সাইকেল ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উনি বেশি দূর তো হেঁটে যেতে পারবেন না! পায়ে চোট লেগেছিল কী করে?"

"আজ্ঞে তা জানি না। আমি একটু বাইরে গেসলুম, সন্ধেবেলা ফিরে এসে দেখি, বড়বাবু পুকুরঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর ওনার জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু ভাল করে হাঁটতে পারছিলেন না!"

"অ্যাঁ? এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না?"

দিপু বলল, "এখানকার লেবুবাগানের আট-দশটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। জ্যাঠামশাই রাত্তিরে উঠে লেবুবাগানে গিয়েছিলেন!"

দারোগাবাবু বললেন, "লেবুগাছ উপড়ে ফেলেছে? কে এসব করেছে? এমন ভালজাতের লেবু এ-তল্লাটে আর কোথাও হয় না!"

এককড়ি বলল, "বড়বাবু রোজ রাতেই লেবুবাগানের ধারে কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। আমাকে বলেছিলেন, রাত্তিরে লেবুপাতার গন্ধ নিশ্বাসে নিলে মন ভাল থাকে। আমিও ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে বসে থাকি।"

দারোগাবাবু এবারে এককড়ির দিকে ফিরে বললেন, "সেই রাতেও গেস্‌লে?"

এককড়ি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ!"

"তোমাদের বড়বাবুকে সেখানে দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, তাও দেখেছি।"

"তারপর?"

"কী তারপর?"

"বড়বাবুকে দেখার পর তুমি কী করলে? উনি কোথায় গেলেন তা দেখলে না? ওনার সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে?"

১৫ই অগাস্ট

এটা হলো স্বাধীনতা দিবসের মাস।

তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জান। ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে সারা দেশ জুড়ে কত বড় আন্দোলন হয়েছিল। কত-শত বীর শহীদ হয়েছেন সেই যুগে। সারা দেশের মানুষ অহিংস আন্দোলনে সামিল হয়ে কারাবরণ করেছেন। আমাদের দিদিমা ঠাকুমারাও সেইসব দিনে ঘরে বসে থাকেন নি। সেইসব কষ্টের মূল্যে পাওয়া গেছে আজকের এই স্বাধীনতা দিবস। ১৫ই অগাস্ট। তাই নিছক একটা ছুটির দিন নয়। খোলা বইয়ের পাতার মত পাওয়া গেছে বলে এই দিনটির মাহাত্ম্য যেন আমরা ভুলে না যাই। যে কোন মানুষের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে দামী জিনিস হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ে, যে সব মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এই দিনটি পালন করা উচিত। আমাদের জাতীয় পতাকার মানে জানতো তোমরা? গৈরিক হল বৈরাগ্য বা ত্যাগ, সাদা হলো শান্তি আর সবুজ হচ্ছে শস্যশ্যামল ভারতবর্ষের প্রতীক। প্রতীক মানে চিহ্ন। মাঝখানে সাদার মধ্যে নীল অশোক চক্র। ইতিহাসের পাতায় পড়েছো অশোকের প্রেম ও মৈত্রীর কথা। তাঁর অহিংস বাণী। নীল রঙের অর্থ ভালবাসা। খুব ছোট থেকেই এসব কথা ভাবতে শিখতে হয়। শুধু পড়াশোনা বা খেলা কিংবা কমিক্‌স্ নয়। আচ্ছা বি-বা-দী বাগ নাম কেন হল বলতো?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

"না, কথা বলিনি। বড়বাবু ব্যস্ত ছিলেন!"

"ব্যস্ত ছিলেন মানে?"

"বড়বাবু লেবুগাছগুলোর সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"গাছের সঙ্গে কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ! অমন অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন কী? গাছের সঙ্গে বুঝি কথা বলা যায় না? যারা পারে, তারাই বলে। আমিও আগে পারতাম, এখন ভুলে গেছি!"

দারোগাবাবু কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই পাগলটাকে তোদের বড়বাবু একটা হাট থেকে ধরে এনেছিলেন না?"

কেষ্ট কোনো উত্তর দিল না। এককড়ি বলল, "আমি পাগল? হে হে হে! তা হলে দুনিয়ায় আর ভাল রইল কে? আমি সব সত্যি কথা বলি কিনা, তাই লোকের কানে ব্যাঁকা-ব্যাঁকা শোনায়। যাক গে যাক, আপনি চা খাবেন তো? চায়ের সাথে আর কী খাবেন, মুড়ি আর ডিমসেদ্ধ?"

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, কিচ্ছু খাব না! পেটটা ভাল নেই। এসেছিলুম কয়েক গণ্ডা গন্ধলেবু নেবার জন্য। আছে নাকি রে?"

কেষ্ট বলল, "লেবু তো সব বেচে দেওয়া হয়েছে। দুটো-একটা ঘরে আছে বোধহয়। এনে দেব?"

দারোগাবাবু বললেন, "তাই দাও! দেখি খোঁজখবর নিয়ে। অত বড় মানুষটা তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না!"

এককড়ি বলল, "তাও পারে! কত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।"

দারোগাবাবু বললেন, "বটে! শোনো হে, তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে একবার থানায় দেখা করবে!"

এবার এককড়ি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। মুখ শুকনো করে বলল, "আমি? না না না, আমি থানা-টানায় যেতে পারব না! ওসব জায়গায় যেতে আমার ভাল লাগে না!"

দারোগাবাবু বললেন, "নিজের থেকে যদি না যাও, তাহলে সেপাই পাঠিয়ে তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা কি ভাল লাগবে? নিজেই চলে এসো, তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্তা আছে।"

তারপর ইরানির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি রাত্তিরে এখানেই থাকবে নাকি?"

ইরানি বলল, "হ্যাঁ। জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজ না পেলে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না!"

দারোগাবাবু বললেন, "সাবধানে থেকো! দিনকাল ভাল নয়। চলি! ওহে এককড়ি, কাল সকালে ঠিক এসো কিন্তু!"

সাইকেলের মুখটা ঘোরালেন দারোগাবাবু। তারপর অতবড় চেহারা নিয়েও বেশ টপ করে উঠে পড়লেন সাইকেলে।

এককড়ি দাঁতমুখ খিচিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল দারোগাবাবুর উদ্দেশে।

কেষ্ট বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দারোগাবাবু মানুষ ভাল, মারধোর তো করবেন না। দেখা করতে বলেছেন, একবার ঘুরে এসো কাল সকালে।"

ইরানি আর দিপু উঠে এল বারান্দায়। সন্তুর কাকাবাবুকে দিপু চিঠি লেখা শুরু করেও শেষ করতে পারেনি। একটু পরে লিখলেও হবে। দিপু বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

হঠাৎ এই ঘরের, বারান্দার আর রান্নাঘরের সব কটা আলোই নিভে গেল একসঙ্গে। নিশ্চয়ই লোডশেডিং!

উঠোন থেকে কেষ্টদা চেঁচিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা করো, আমি হারিকেন জ্বেলে দিচ্ছি!"

ইরানি জিজ্ঞেস করল, "এই দিপু, তুই টর্চ আনিসনি?"

দিপু বলল, "আমি কী জানি, তুমিই তো জিনিসপত্তর গুছিয়ে এনেছ!"

ইরানি বলল, "জ্যাঠামশাইয়ের নিশ্চয়ই টর্চ আছে। কেষ্টদা এলে খুঁজে দেখতে হবে।"

দিপু টর্চের জন্য অপেক্ষা করল না। সে মনে-মনে ঠিকই করে ফেলেছে, রাত্তিরে সে একা-একা আর-একবার লেবুবাগানে যাবে। এখন অবশ্য বেশি রাত হয়নি, মাত্র সাতটা কি সাড়ে সাতটা বাজে।

সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরটার দিকে।

এককড়ি হারিকেন বা মোম জ্বালেনি। বসে আছে জ্বলন্ত উনুনের সামনে। আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। দিপুর পায়ের শব্দ পেতেই বেশ জোরে বলে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

দিপু বলল, "আমি।"

এককড়ি কড়া গলায় বলল, "এখানে কী চাই? এর মধ্যে আবার খিদে পেয়ে গেছে নাকি? এখন কিছু হবে না!"

দিপু বিনীতভাবে বলল, "না, এককড়িদা, আমার খিদে পায়নি। এমনি তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলুম।"

"আমি গল্পটল্প কিছু জানি না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে উনপঞ্চাশ! হেঃ! আমায় নিয়ে টানাটানি!"

দিপু চুপ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকবাদে এককড়ি আবার বলল, "কী চাই আমার কাছে? খুলেই বলো না!"

দিপু বলল, "এককড়িদা, তুমি রাত্তিরবেলা লেবুবাগানে যাও, আজ রাত্তিরে আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে?"

এককড়ি বলল, "না! আবার কী ঝঞ্ঝাট-টঞ্ঝাট হবে! ওসবের মধ্যে আমি নেই।"

দিপু বলল, "আচ্ছা, তুমি যে বললে, জ্যাঠামশাই লেবুগাছগুলোর সঙ্গে কথা বলতেন! কী কথা বলতেন, তুমি শুনেছিলে?"

এককড়ি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি। সেদিন উনি লেবুগাছগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, ওগো, আমায় বলো না, আমার পেয়ারাবাগানটা কে পুড়িয়ে দিল? তোমরা ঠিক জানো, তোমরা তো দেখেছ..."

এককড়ির কথার মাঝখানেই বাইরে কামানগর্জনের মতন প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। দিপু ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে দৌড়ে চলে এল এককড়ির কাছে।

এককড়ি বলল, "আবার কোথায় বাজ পড়ল। ক'দিন ধরেই দেখছি যখন-তখন মেঘ আর বৃষ্টি আর বজ্রপাত! খুবই অলুক্ষুনে ব্যাপার। খুবই অলুক্ষুনে!" (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

নানারকম নানাসাহেব

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

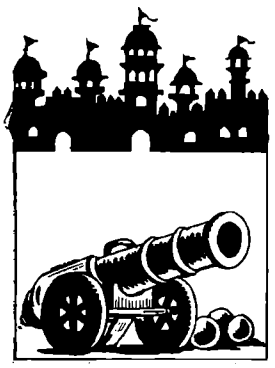

সিপাহি-যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন নানাসাহেব, তাঁর ভাই বালাসাহেব, অযোধ্যার বেগম হজরতমহল ও আরও কয়েকজন নেতা নানাসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেনাপতি ক্লাইভের সৈন্যরা রাপ্তি নদীর কাছে নানাসাহেবকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন। ইচ্ছা ছিল ধরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু কোম্পানির সৈন্যের তাড়া খেয়ে নানাসাহেব, তাঁর সঙ্গীরা ও কয়েক হাজার লোক নেপালে ঢুকে পড়লেন। নানাসাহেবের সঙ্গে আটটি হাতি ধনরত্নে বোঝাই।

নেপালে ঢুকে যাবার পরে নানার কী হল ? বলা খুব মুশকিল। নেপালের মন্ত্রী রানা জঙ্গবাহাদুর নাকি নানাকে বললেন, তোমাকে আমি ধরিয়ে দেব না। কিন্তু তোমার স্ত্রী কাশীবাঈকে, ও যা গয়নাগাঁটি এনেছ, সব আমার কাছে রেখে যেতে হবে। নানাসাহেব প্রথমটায় ইতস্তত করছিলেন। তারপর দেখলেন, তাঁর রাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নানাসাহেব যত ধনরত্ন, গহনা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে দামি ও বিখ্যাত ছিল 'নওলখা হার' ; খুব দামি হিরে, মণি, মুক্তো, পান্না এইসব দিয়ে তৈরি। তার বদলে রানা কাশীবাঈকে একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে দিলেন। কিছু সম্পত্তিও দিয়েছিলেন।

বছরখানেক আর বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। নেপালের তরাই অঞ্চলে খুব ম্যালেরিয়া। ইংরেজরা খবর পেতে লাগলেন যে, নানাসাহেবের ভাই বালাসাহেব ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে মারা গেছেন, তার মাসখানেকের মধ্যে নানাসাহেবও গত হয়েছেন। এ-রকম হওয়া অসম্ভব ছিল না। ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে মিটল না। মাঝে-মাঝে খবর আসতে লাগল, নানাসাহেব অথবা নানাসাহেবের মতো একটি লোককে নেপালের এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। নানারকম খবর। কেউ বলেছে, নানাসাহেবের তখন খুব দুরবস্থা, সঙ্গে মাত্র একটি লোক। কেউ বলেছে, নানাসাহেবকে দেখলাম, সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জন গেরুয়া-পরা লোক, তারা কিন্তু আসলে সন্ন্যাসী নাও হতে পারে। আর একজন বলেছিল, সে নানাসাহেবকে দেখেছে, সঙ্গে কয়েক হাজার লোক, কয়েকটি হাতি আর ত্রিশটি কামান। আর একজন বলেছিল, লোকটি খুব দানধ্যান করেন। দিনে কয়েকবার পুজো-আচ্চা করেন। তাঁর পুজোর বাসন সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি। এইসব গল্প কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে, বুঝে ওঠা মুশকিল। নেপালের রানা জঙ্গবাহাদুর প্রথম-প্রথম বলতেন, নানাসাহেব বেঁচে নেই। পরে তাঁরও মত বদলে গেল। তিনি ইংরেজদের বলে পাঠালেন যে, নানার ভাই যে মারা গিয়েছে, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নানা সম্বন্ধে তিনি জানেন না কী হয়েছে। হয়তো তিনি বেঁচে আছেন, অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।

১৮৬২ সাল থেকে নানারকম গোলমেলে খবর শোনা যেতে লাগল। হরজি ব্রহ্মচারী নামে একজন করাচিতে ধরা পড়লেন। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু, নাম ব্রজদাস। কারও কারও ধারণা হল, হরজি ব্রহ্মচারী আর কেউ নন, নানাসাহেব স্বয়ং। ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। হরজি ব্রহ্মচারীর শরীরের অবস্থা তখন খুব খারাপ। তাঁকে জাহাজে করে কলকাতায় নিয়ে এসে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল। হরজি ব্রহ্মচারী কয়েকদিন ভুগে সেখানে মারা গেলেন। এটা যে ইংরেজ পুলিশের মারাত্মক ভুল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরে জানা গেল, হরজি ব্রহ্মচারী ধর্মীয় বই লিখতেন। হরজি ব্রহ্মচারীর বন্ধু ছাড়া পেয়ে গেলেন।

এরপরে যে ঘটনা ঘটল, সে আরও বেশি চমকপ্রদ। আজমিঢ়ে আবার আর-এক 'নানাসাহেব' ধরা পড়লেন। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার মেজর ডেভিডসন সাহেবের কাছে খবর এল যে, নানাসাহেব আজমিঢ়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এক হাজার সৈন্য ছিল। তারা অন্যত্র চলে গিয়েছে। আজমিঢ় থেকে একটি লোককে নানা মনে করে ধরে নিয়ে আসা হল। নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করবার জন্য যে হুলিয়া বের করা হয়েছিল, তার সঙ্গে লোকটির চেহারা মিলিয়ে নিয়ে ডেভিডসন ও আজমিঢ়ের সিভিল সার্জন দু'জনেরই বিশ্বাস হল, এ ব্যক্তি নানাসাহেব না হয়ে যায় না। চেহারায় কিছু গরমিল আছে বটে, কিন্তু এতদিন ধরে নেপালের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরলে ওরকম তো হতেই পারে। আগে বেশ মোটাসোটা ছিলেন, এখন রোগা হয়ে গিয়েছেন। নানাসাহেবের ফোটোগ্রাফ তুলে তিনজনের কাছে পাঠানো হল। তাঁরা আগে নানাকে ভাল করে চিনতেন। একজন হলেন বারাণসীর ডঃ চিক্, আর দু'জন হলেন মিরাট ও ফৈজাবাদের সামরিক কর্মচারী। ডঃ চিক্ নানাকে অনেকবার দেখেছেন, তিনি ফোটোগ্রাফ দেখে বললেন, এ কখনও নানাসাহেব হতে পারে না। তারপর বন্দীকে যখন কানপুরে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন বললেন, এঁর গলার স্বর আলাদা, নানার চেয়ে গায়ের রং কালো, এবং নানার তখন যে বয়স হওয়া উচিত ছিল, এঁর বয়স তার চেয়ে বছর-পনেরো বেশি। কানপুরের আগেকার সিভিল সার্জন নানাসাহেবকে এক সময় চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বললেন, নানার সঙ্গে এঁর চেহারার কিছু মিল থাকতে পারে, কিন্তু এই লোক নানাসাহেব নন। খবরের কাগজে কিছুদিন উত্তেজিত আলোচনা চলবার পর ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

আবার শোনা গেল, মেবারে একজন নানাসাহেবকে পাওয়া গিয়েছে। কিছুদিন পর শোনা গেল, কানপুরে। সেখানে তিনি নাকি সিন্ধিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সিন্ধিয়া তাঁকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সিন্ধিয়ার

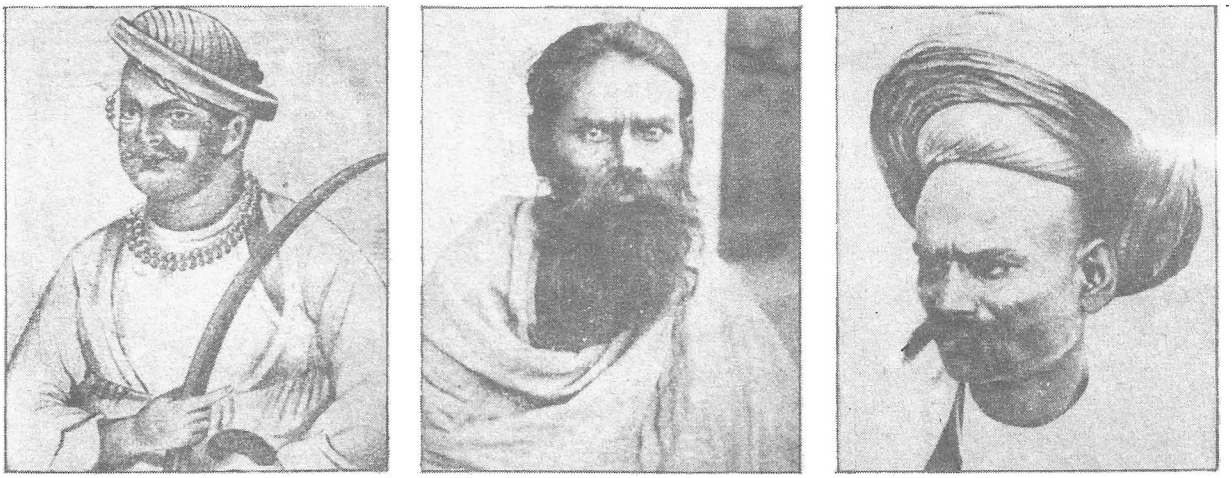

(বাঁয়ে) সিপাহিবিদ্রোহের নিরুদ্দেশ নায়ক নানাসাহেব। (মাঝখানে) নানাসাহেব ভেবে ভুল করে যাঁদের ধরা হয়েছিল, ইনি তাঁদেরই একজন। (ডাইনে) দাড়ি কামিয়ে পোশাক পালটিয়ে দেখা গেল, ভুল লোক

বিশ্বাস হল, তিনি নানাসাহেব। তিনি তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। আবার কানপুরে নিয়ে এসে নানাকে পরীক্ষা করা হল। সেখানে একজন ইংরেজ ডাক্তার বললেন যে, যদিও তিনি নানাকে আগে চিকিৎসা করেছেন, তাহলেও ঠিক চিনতে পারছেন না। আসল নানাসাহেবের চেয়ে এঁর বয়স তো অনেক কম মনে হচ্ছে।

মওব্রে টমসন নামে কানপুরে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক নানাকে বারদুয়েক দেখেছিলেন। আগেকার আর-এক ইংরেজ সাক্ষীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল। তিনিও বললেন, এঁর গলার স্বর অন্যরকম। নানাসাহেবের সুখের দিনে তিনি যাঁকে নানাসাহেব বলে জানতেন, তাঁর চেয়ে এঁর চেহারা তো অন্য রকম। তার উপর এঁর মুখে বড় দাড়িগোঁফ, কামিয়ে ফেললে বোধহয় চেনার সুবিধা হবে। নাপিত ডেকে দাড়ি কামিয়ে ফেলা হল, তারপরে মহারাষ্ট্রীয় পোশাকও পরিয়ে দেখা হল। মওব্রে টমসন নিজের মন বুঝতে পারেননি। কামাবার পর বললেন, চেহারার তো বেশ কিছু মিল আছে দেখছি, একটা কাটা দাগও মিলে যাচ্ছে, কিন্তু একথা কী করে বলব যে, এই লোক নানাসাহেব ? অনেকেই সিন্ধিয়ার প্রাসাদে এসে বন্দীকে দেখেছিলেন। একজন বললেন, "আরে, এঁকে আমরা চিনি, এঁর নাম তো যমুনা দাস। যমুনা দাস আবার কী করে নানাসাহেব হবেন ?"

অন্য উদাহরণও আছে। আপ্টে পরিবারের সঙ্গে নানাসাহেবের পরিবারের কুটুম্বিতা ছিল। সম্পর্কে বাবা আপ্টের ছেলে ছিলেন নানাসাহেবের জামাই। তাঁরও তখন বয়স হয়েছে। তাঁকে নানাসাহেবের কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি পকেট থেকে চশমা বার করে পরলেন ; তারপর কিছুক্ষণ বন্দীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আরে, তুমিই তো নানাসাহেব !" ব্যাপারটা খুব নাটকীয়। পরে আপ্টেই বলেছিলেন, লোকটি নানাসাহেব হতে পারেন না। তাঁর বুঝবার ভুল হয়েছিল।

এ-গল্পের এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর পরেও আর একটি ছোট কাহিনী আছে। ল্যানডন নামে এক সাহেব সিপাহি-বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পরে নেপালের একটি ইতিহাস লেখেন। নেপাল সরকার তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর লেখা বইয়ে একটি উপসংহার আছে। সেটি বলে এ-কাহিনী শেষ করব। ল্যানডন লিখছেন, রাজকোট থেকে মাইল-ত্রিশ দূরে একটি ছোট শহরে এক ভিখিরি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের পোশাক জীর্ণ। বিড়বিড় করে বলছে, "আমি নানাসাহেব। নেপালের জঙ্গবাহাদুর আমার সব কেড়ে নিয়েছে। এর বিচার চাই।" তার পিছনে একদল ছেলে। কেউ কেউ চলতে চলতে তার গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে। আরও নানা রকমে তাকে উত্ত্যক্ত করছে। এই অবস্থা দেখে একজন পুলিশের দয়া হল। ছেলেদের অত্যাচার আরও বাড়তে পারে এই মনে করে তাকে রাত্তিরের মতো গারদখানায় রেখে দেওয়া হল। রাত্রে ভিখিরিটির খুব জ্বর এল। জ্বরের মধ্যে সে বলতে থাকে, "আমি নানাসাহেব, বিঠুরের নানাসাহেব।" ১৮৫৭-৫৮ সালে যেসব ঘটনা সিপাহি-যুদ্ধের সময় হয়েছিল, তার টুকরো টুকরো বিবরণ সে জ্বরের ঝোঁকে বলতে লাগল। এই যদি সত্যি নানাসাহেব হয়, এই কথা ভেবে প্রহরীরা তাদের উপরওলাকে ডেকে নিয়ে এল। উপরওলা একজন অল্পবয়সের ইংরেজ। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিখিরির কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। শুনে বিশ্বাস হল, এতদিন পরে সত্যিকারের নানাসাহেব ধরা পড়লেন। কলকাতায় ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করা হল। কর্মচারীটির মনে অনেক আশা : পুরস্কার খ্যাতি চাকরির উন্নতি। কলকাতায় পাঠানো টেলিগ্রামে ছিল, "নানাসাহেবকে গ্রেপ্তার করেছি, এখন কী করব ?" পরদিন টেলিগ্রামে যে জবাব এল, তাতে তিনি মুষড়ে পড়লেন। জবাবে লেখা, "তাকে ছেড়ে দাও।"

এই হচ্ছে নানাসাহেব সম্বন্ধে বোধহয় শেষ কাহিনী। সরকার অনেকদিন থেকেই নানাসাহেবের গ্রেপ্তারের ভুল খবরে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। নানাসাহেব সম্বন্ধে অনেক ভুল খবর পেতে পেতে এক উঁচুতলার কর্মচারী বলেছিলেন, "ইচ্ছা হয় নানাসাহেবের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এদেশ থেকে চলে যাই !"

বিমানদস্যুদের কবলে

শেখর বসু

"আমরা আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছি, এই সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি-দাওয়া যদি মেনে নেওয়া না হয়, আমরা গোটা প্লেনটাই উড়িয়ে দেব। আপনারা ভগবানের নাম করুন।"

মাইক্রোফোনে এই কথাগুলো শোনার পরেই হিমশীতল একটা প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল যাত্রীদের মেরুদণ্ডে। কেউ-কেউ কেঁদে ফেললেন, কেউ-কেউ বিমানদস্যুদের কথামতো ভগবানের নাম নিতে লাগলেন মৃদু গলায়, কেউ-কেউ তখনও আশা-নিরাশার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, এ-যাত্রা যদি ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে যাওয়া যায়! অনেকের চোখ হাতঘড়ির দিকে। পাথরের মতো ভারী মুহূর্তগুলো একটু-একটু করে গড়িয়ে যাচ্ছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এয়ারবাসের আড়াইশোজন যাত্রী দুঃসহ অবস্থা থেকে কুড়ি ঘণ্টা বাদে মুক্ত হয়ে এক-এক করে নেমে এলেন লাহোর বিমানবন্দরে।

ওই যাত্রীদের মধ্যেই ছিল পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনগর সরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র পার্থ গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আসছিল বাড়িতে। তার সেই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছে কলকাতায় বসে।

পাঁচ জুলাই। বিকেল সওয়া-চারটের সময় এয়ারবাসের ৪০৫ নম্বর ফ্লাইট শ্রীনগর বিমানবন্দরের রানওয়েতে গোটাকয়েক চক্কর মেরে লাফিয়ে উঠল আকাশে। আড়াইশো যাত্রীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল বিদেশী। 'ক্রু'র সংখ্যা জনা-নয়েক।

বানিহাল টানেলের ওপর দিয়ে বিমানটি তখন উড়ে যাচ্ছিল। টেক-অফের পরে মাত্র মিনিট-পনেরো সময় গেছে, হঠাৎ পেছন-দিকের যাত্রীদের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কী ব্যাপার বোঝার আগেই আর-একটা হৈ-চৈ উঠল সামনের 'একজিকিউটিভ ক্লাস' থেকে। তারপরেই কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল খুব দ্রুত।

দুম-দুম করে গুলির আওয়াজ। হাতে পিস্তল, ছুরি নিয়ে পাগড়িধারী কয়েকজন শিখ যুবক ছুটে গেল ককপিটের দিকে। ধস্তাধস্তির শব্দ। একটু পরেই মাইক্রোফোনে শোনা গেল : আপনারা যে-যার সিটে চুপচাপ বসে থাকুন। প্লেনটি হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা এইভাবেই আমাদের সমস্যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে চাই।

বক্তব্যটি যাত্রীদের শোনানো হল ইংরিজি, হিন্দি, আর গুরুমুখী ভাষায়। তারপরেই শুরু হয়ে গেল বিমানদস্যুদের হামলা।

পার্থর হিসেবে বিমানদস্যুদের সংখ্যা আট। এরা সবাই পাগড়িধারী শিখ। সবচেয়ে ছোট দস্যুটার বয়স বছর-ষোলো, আর সবচেয়ে বড়টার বয়স বছর-পঁয়ত্রিশ। বাকিদের বয়স

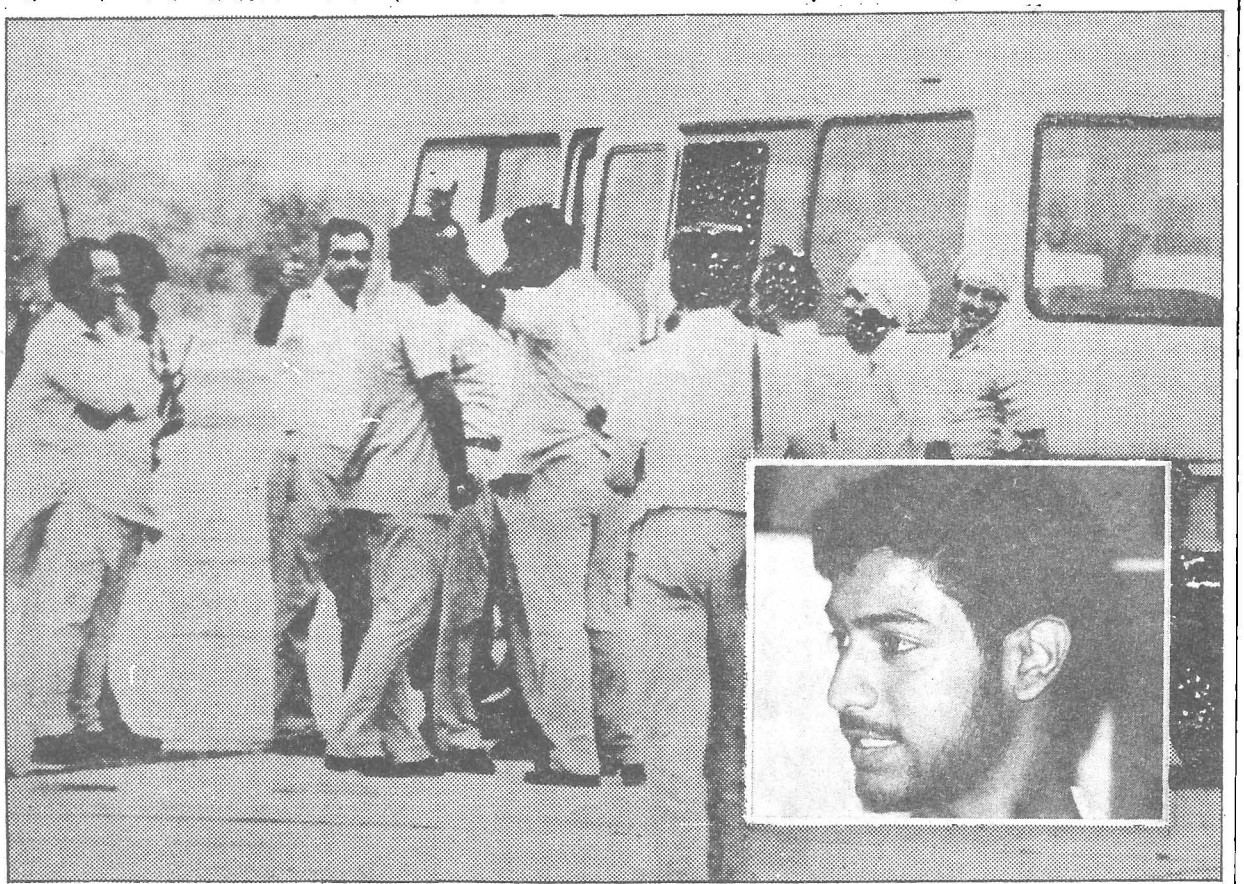

লাহোর বিমানবন্দর, দস্যুদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ইনসেট) পার্থ, আনন্দমেলার দফতরে বসে সে তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছে

পঁচিশের আশেপাশে। এদের দুজনের হাতে ছিল পিস্তল (পার্থ পরে সহযাত্রী এক আর্মি-মেজরের কাছ থেকে জেনেছে, পিস্তল দুটি ছিল ·২৫ এবং ·৩০ ক্যালিবারের। ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে এই পিস্তলে গুলি চালালে মৃত্যু অবধারিত), ছুরি, লাঠি, এবং কুড়ুল। পার্থর মতে কুড়ুলটি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের, আর ওই লাঠিটি একজন প্রতিবন্ধী যাত্রীর ওয়াকিং-স্টিক।

ক্রু এবং যাত্রীদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্যে বিমানদস্যুরা প্রথমেই একচোট মারধোর করে নিল কয়েকজনকে। বাধা দিতে গিয়ে দস্যুদের হাতে নির্মমভাবে মার খেলেন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার মহাজন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্যারেড করানো হল যাত্রীদের সামনে।

থেকে-থেকে যাত্রীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিল : খবর্দার ! কেউ সিট ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করবেন না। সিট-বেল্ট বেঁধে বসে থাকুন চুপচাপ। আর সেই সঙ্গে চলছিল যাত্রীদের স্লোগান পড়ানো। বলুন—"সত্ শ্রী আকাল, যো বোলে সো নিহাল", "ওয়াহে গুরু সত্যনাম", "রাজ করেগা খালসা", "খালিস্তান জিন্দাবাদ"—এইসব। একবিন্দু অর্থ না বুঝে বিদেশী যাত্রীদেরও ঠোঁট নাড়তে হয়েছিল স্লোগানের সঙ্গে।

বিমানটির যাওয়ার কথা ছিল দিল্লি হয়ে বোম্বেতে, কিন্তু বিমানদস্যুদের খপ্পরে পড়ে উড়ে এল লাহোরের আকাশে। এখানে আসার পর নতুন এক বিপত্তি দেখা দিল। পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে লাহোর বিমানবন্দরে নামতে দেবেন না। এখন উপায় ? উপায় বার করার জন্যে মাথা খাটাতে শুরু করে দিল দস্যুরা, আর তাদের নির্দেশে লাহোরের আকাশে ক্রমাগত চক্কর খেতে লাগল বিমানটি। এইভাবে ঘণ্টা-দেড়েক পাক খাওয়ার পরে নামার অনুমতি পাওয়া গেল।

সন্ধে সাড়ে-সাতটা নাগাদ লাহোর বিমানবন্দরে নেমে এল বিমানটি, কিন্তু আকাশ আর মাটির মধ্যে কোনো তফাত নেই। বরং যাত্রীদের দুশ্চিন্তা আর দুর্ভোগ বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর। খাবারদাবার নেই, খাবার জলেরও অভাব। জানলা-দরজা-বন্ধ বিমানে দুঃসহ গরম। বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তার ওপর আছে দস্যুদের হুমকি, মারধোর আর স্লোগান পড়ানো—খালিস্তান জিন্দাবাদ।

সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে সিটের ওপর ঠায় বসে বসে ভয়ংকর সেই রাত কাটিয়ে দিলেন যাত্রীরা।

ভোরের আলো ফুটতেই জানলায় চোখ রাখল পার্থ। "দেখি কি প্লেনের পাশে মাটিতে নতুন-খোঁড়া গর্ত। গর্তের মধ্যে টেলিস্কোপিক রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে পাকিস্তানি জঙ্গি বাহিনীর সেনারা। দেখে মনে সামান্য আশার আলো জাগল। ভাবলাম, এবার বোধহয় উদ্ধার পাওয়া যাবে।"

কিন্তু, তেমন কোনো ঘটনাই ঘটল না। বেলা বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। টের পাওয়া গেল, বিমানদস্যুদের সঙ্গে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু কী কথা, তার পরিণামটাই বা কী ?

অসহ্য অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে পার্থ একবার ভেবেছিল, মরিয়া হয়ে একটা কাউন্টার-অ্যাটাক করলে কেমন হয় ! কিন্তু আশপাশের যাত্রীদের সঙ্গে মতলব আঁটার সময় এক দস্যুর চোখে পড়ে গেল। তার হাতে ছিল কুড়ুল। ওই

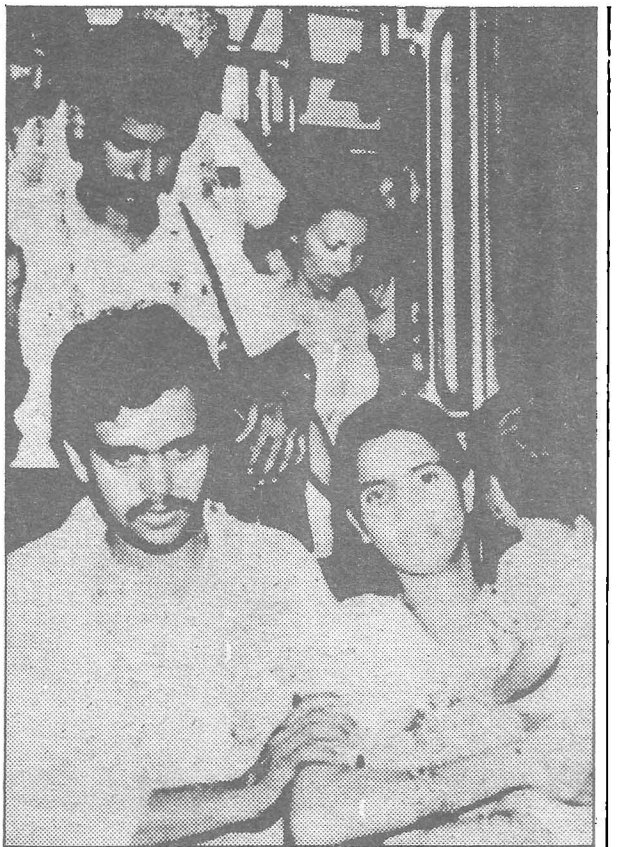

দিল্লিতে প্রত্যাগত উদ্ধারপ্রাপ্ত যাত্রিদল

কুড়ুলের পেছন দিয়ে অতর্কিতে পার্থর মুখে আঘাত করে দস্যু বলল, সাবধান ! এদিক-ওদিক করলে জানে মেরে দেব।

বেলা আরও বেড়ে গেলে উৎকণ্ঠিত যাত্রীরা দস্যুদের সেই হুঙ্কার শুনলেন : ভারত-সরকার আমাদের দাবিদাওয়া মেনে নেয়নি। পাকিস্তান-সরকারও তেমন সহযোগিতা করছে না। আমরা আলটিমেটাম দিয়েছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের কথা মেনে না নেওয়া হলে আমরা গোটা প্লেনটাই বোমা মেরে উড়িয়ে দেব। আপনারা ভগবানের নাম করুন। শেষ প্রার্থনা সেরে নিন।

তবে, পাঁচ মিনিট সময় পেরিয়ে যাবার পরেও বোমা ফাটল না। দশ মিনিট বাদেও নয়। যাবতীয় উদ্বেগ আর উত্তেজনার শেষ হল আরও কিছুক্ষণ পরে। দস্যুদের নেতা মাইক্রোফোনে বেশ কিছু লম্বা-চওড়া কথা শোনাবার পরে বলল: মানবিকতার কারণে আপনাদের আমরা মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে-সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল চারপাশে। তারপরেই প্লেন থেকে নামার জন্যে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি।

পার্থ ছিল শেষের দিকে। এক দস্যুর চোখে জল দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? আপনি কাঁদছেন কেন ?"

দস্যু সে-কথার জবাব দেয়নি, তবে পার্থর অনুরোধে বীরপুরুষী ঢঙে শুভেচ্ছাবাণী সমেত দিব্যি এক অটোগ্রাফ দিয়ে দিয়েছে তার খাতায়। দস্যুর নাম পিংকা।

এর পরের সব ঘটনা আনন্দের। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আটক-পড়া যাত্রীদের খুব খাইয়েদাইয়ে, শহর দেখিয়ে নিজেদের বিমানে করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লিতে। সে তো তোমরা জানোই।

টিনটিন

প্রোফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাকে দেখেছিলুম, এবং যে তোমাকে লেঙ্গি মেরেছিল, তাদের বর্ষাতি একেবারে একইরকম।
বলো কী !
এগিয়ে যাও স্তেফান !
TAXI
GE 7051
ডাইনে ঘুরিয়ে, পথ আটকে দাও !
ক্রি-ই-ই-চ্ !
?
সর্বনাশ ! ... ট্যাক্সির চাকা পিছ্‌লে গেছে !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
একজন ওই উঠেছে !
বাচ্চাও আছে !
ড্রাইভার ? কুটুস ?
কিচ্ছু জানি না !
ব্লাব্ ব্লাব্
কুটুস কোথায় ?
কী জানি !
!
ব্লাব্ ব্লাব্
ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ
ব্যাটা পাজি !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

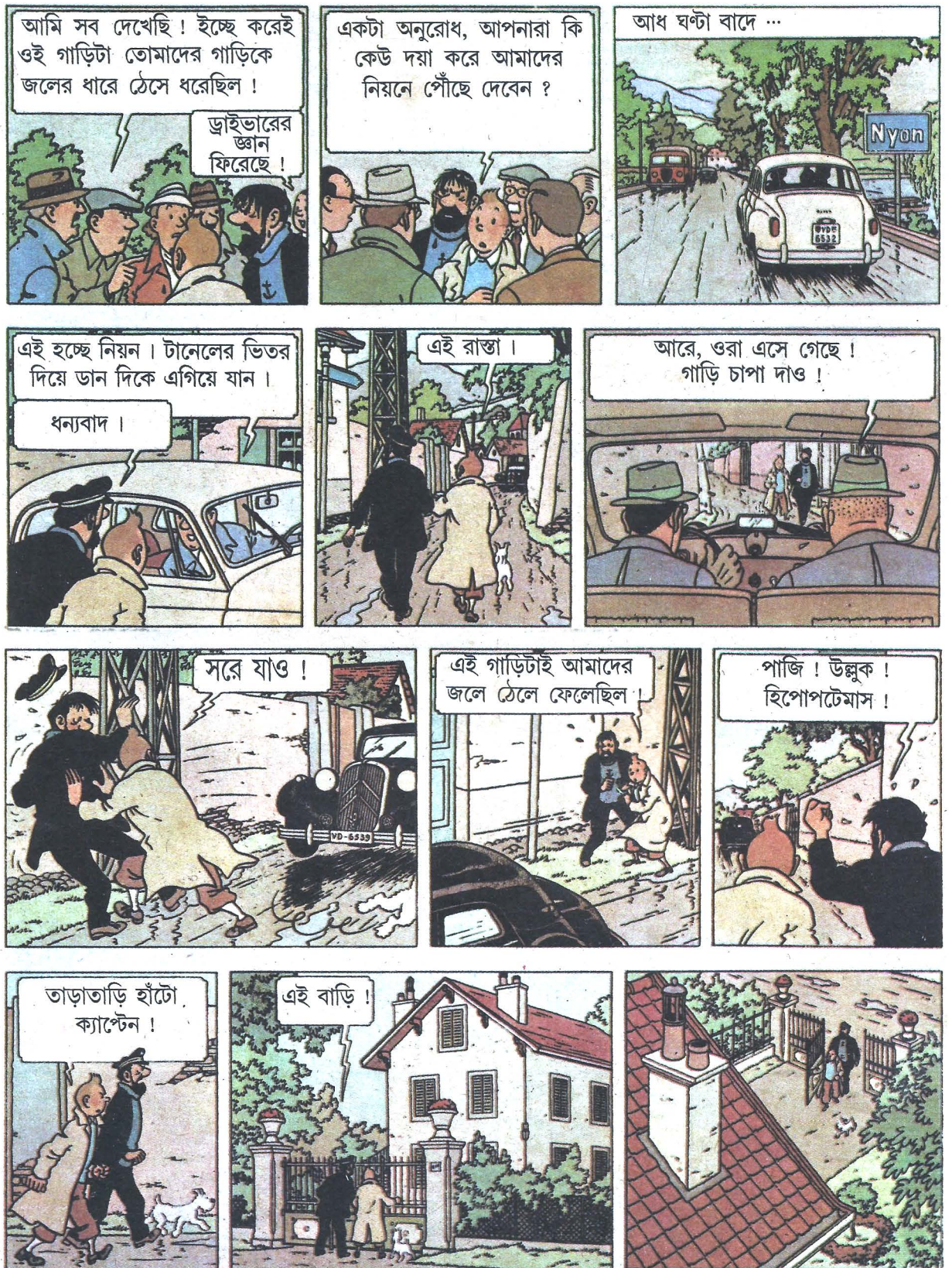

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

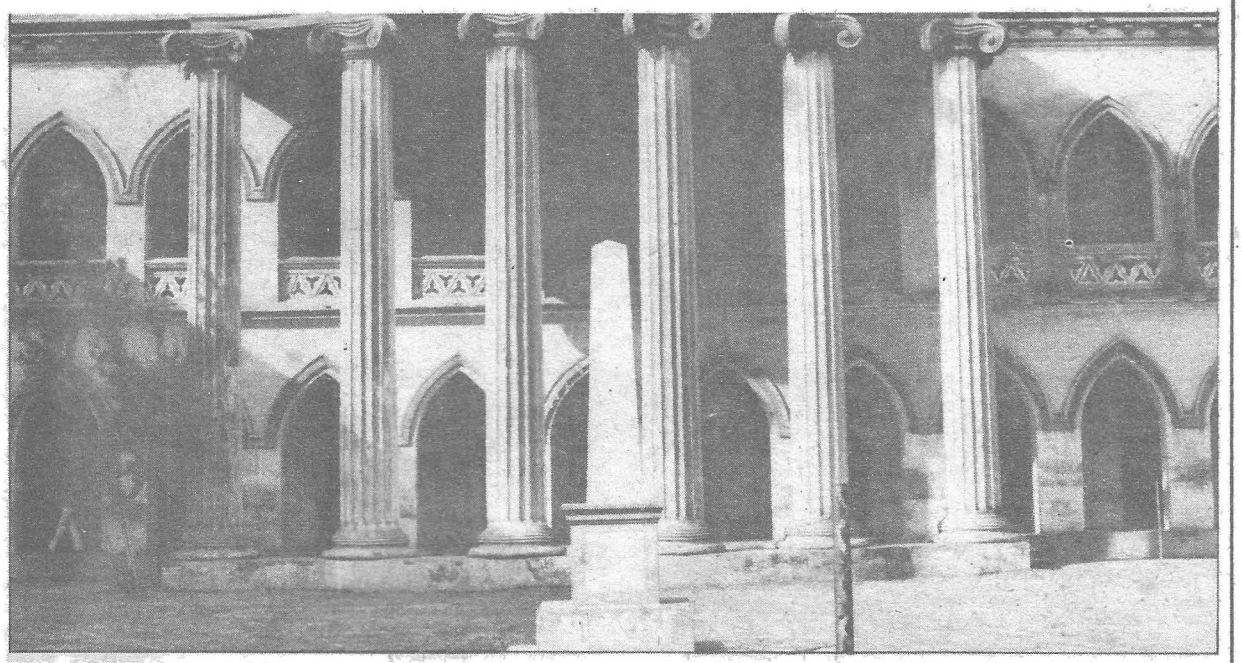

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুলের প্রতিষ্ঠা ১৮৫৩ সালে। জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই স্কুলের বিশাল ভবন বহুদিনের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁর মামা মহারাজ কৃষ্ণনাথ নন্দীর নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

কৃষ্ণনাথ কলেজ-স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১১৫০। ক্লাস শুরু হয়েছে পঞ্চম শ্রেণী থেকে। প্রতি বছর ৯০ থেকে ১০০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। গত বছর ৩৫ শতাংশ প্রথম বিভাগে এবং ৫০ শতাংশ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুব্রত বাগচী কিছুদিন আগে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিষয় ইংরেজি।

বাংলা ও ইংরেজি কীভাবে পড়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতবাবু জানালেন "সাধারণত অধিকাংশ ছাত্রই নিজেদের প্রস্তুতিকে বাঁধাধরা কিছু প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তার ফলে ভাষার মাধ্যমে তাদের

চিন্তার বিকাশ যথাযথ হতে পারছে না। এজন্য গোটা টেক্সট ভালভাবে পড়া এবং সেই সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে লাইব্রেরি-ওয়ার্ক করা দরকার। বানানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। একইসঙ্গে

"ভূগোলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, ম্যাপের ব্যবহার, চার্ট তৈরি ও ব্যাপক নিরীক্ষণের গুরুত্ব খুবই বেশি।"

উচিত নানান বই পড়া ও প্রচুর লেখা। নইলে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আসবে কোত্থেকে?" ইংরেজির বিষয়ে তিনি বিশেষ করে বলেন, "প্রারম্ভিক সিলেবাস অনেকক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়। এই কারণেই শুরু থেকে এই বিষয়ে বাড়তি যত্ন নিতে হবে।"

অঙ্কের বিষয়ে শ্রীবাগচী বললেন, "শুরু থেকেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর এই বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের ভয় থাকে। ভয় কাটাবার জন্যই নিয়মিতভাবে অঙ্ক কষতে হবে। নানান ধরনের অঙ্ক টেস্ট পেপার বা বই থেকে সংগ্রহ করে বেশি-বেশি করে অভ্যাস করলে নিজের উপরে আস্থা আসবে। প্রয়োজনবোধে একই অঙ্ক বারবার করতে হতে পারে। পরীক্ষার হলে যথাসম্ভব ধীরস্থির থেকে অঙ্ক কষলে ফল ভাল হয়।"

ভূগোল সম্পর্কে শ্রীবাগচী বলেন, "ভূগোলের জ্ঞান প্রত্যেকেরই থাকা দরকার। ভূগোলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, ম্যাপের ব্যবহার, চার্ট তৈরি ও ব্যাপক নিরীক্ষণের গুরুত্ব খুবই বেশি। তা ছাড়া

নমুনা সংগ্রহের কাজ করা যেতে পারে। এতে ভূগোলের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ বোধ করবে।"

অন্যান্য বিষয় কীভাবে পড়া দরকার, সে সম্পর্কে সুব্রতবাবু বলেন, "ইতিহাস পড়বার সময় অতীতকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে বর্তমান অবস্থার যোগসূত্রের কথাটা বোঝা দরকার। এ ছাড়া কিছু-কিছু ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করা চাই। ইতিহাসের বিচারে যে-সব জায়গা গুরুত্বপূর্ণ, ম্যাপে সেগুলিকে সূচিত করে ইতিহাস পড়লে বিষয়টি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের নানা শাখার প্র্যাকটিকাল ক্লাস চিত্তাকর্ষক হলে এবং বিজ্ঞানের নানান ব্যবহারিক প্রয়োগ ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমতো দেখাতে পারলে বিষয়টি সম্পর্কে তারা যেমন আগ্রহী হয়, তেমনি চটপট সব বুঝতেও পারে।

"*কর্মশিক্ষা* বিষয়টি ভাল করে রপ্ত করা দরকার। স্বাবলম্বনের শিক্ষা পেতেও কর্মশিক্ষা সকলকে সাহায্য করে। এ-শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে কার্যকর হতে পারে, এ-কথা মনে রেখে ধৈর্য ধরে বিষয়টির প্রতি মনঃসংযোগ করা দরকার।"

উত্তর লেখার সময় কী কী ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবাগচী বলেন, "প্রথমেই প্রশ্নটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। সহজ ভাষায় লেখা, শুদ্ধ বানান ও ক্রিয়াপদের নির্ভুল ব্যবহার নিঃসন্দেহে পরীক্ষার্থীর সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করে। বেশি নম্বর তুলতে হলে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে।" তা ছাড়া তিনি বললেন যে, পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠন, শরীরচর্চা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যও অত্যন্ত জরুরি।

সুব্রতবাবু মনে করেন, বইয়ের ছাপা নির্ভুল হওয়া দরকার। নইলে ছাত্রছাত্রীরা ভুল-বানান শিখতে পারে। সেজন্য এই বিষয়টিতে সকলের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। শ্রীবাগচী 'আনন্দমেলা'র একজন অনুরাগী পাঠক। তাঁর বিশ্বাস, এই পত্রিকা পড়ে ছাত্রছাত্রী-সমাজ খুবই উপকৃত হচ্ছে।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

এবার ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সমীর পাল। সমীর প্রতিবারই ভাল রেজাল্ট করে। ওরা বহরমপুরের পুরনো বাসিন্দা। সমীর বাংলা ও ইংরেজি পড়ার সময় অজানা শব্দের অর্থ ভালভাবে জেনে নেয়। এক-একটা অংশ পড়া হয়ে যাওয়ার পর সেই অংশের উপর যাবতীয় প্রশ্ন সংগ্রহ করে, তারপর সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে বাড়ির লোক ও স্কুলের শিক্ষকদের দেখিয়ে নেয়। কীভাবে আরও ভাল লেখা যাবে, সে-বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনাও করে। টেস্ট পেপার থেকে বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক নির্বাচন করে সময় ধরে সেগুলো কষে। এভাবেই সে তাড়াতাড়ি নির্ভুল অঙ্ক কষার অভ্যাস করে যাচ্ছে। ভোরে উঠে পড়তে তার ভাল লাগে, বস্তুত সেই সময়েই সে মনে-রাখার অংশগুলি পড়ে নেয়। ছুটির দিনে, বিশেষ করে দুপুরে, অঙ্ক কষে ও বিজ্ঞান পড়ে। স্কুলের পড়ার মতো বাড়িতে পড়ার জন্যও সে মোটামুটি একটা রুটিন তৈরি করে নিয়েছে। একটা বিষয় খানিকটা পড়ার পর একটু বিশ্রাম নেয়।

এ. সি. সেনের ইংরেজি গ্রামার, টেন এগজামিনার্স-এর অঙ্ক, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ-বিচিন্তা, জে. এন. রায়ের ভৌতবিজ্ঞান ইত্যাদি বই থেকে সমীর প্রচুর সাহায্য পেয়েছে।

পড়াশুনোর সঙ্গে-সঙ্গে সে খেলাধুলোও করে। বিশেষভাবে ভাল লাগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। সমীরের হবি ডাকটিকিট জমানো। এছাড়া সাধারণ জ্ঞানের অনেক বই পড়ে। 'পাক্ষিক আনন্দমেলা' পড়তে খুব ভাল লাগে। এই পত্রিকার 'সহজে ইংরেজি' বিভাগ থেকে সমীর প্রচুর উপকার পেয়েছে বলে জানাল।

জয়ন্ত ঘোষ

ভুতোর জুতো

অভীক বসু

মাঝরাতে কেবা ছাদে
হাঁটে গটমট ?
ভূতপ্রেত হয় যদি
ঘুমো চটপট।
ভয় পাই সব্বাই,
এ-আওয়াজ জোর,
ভূত নয়, পাকড়াও
নির্ঘাত চোর।
লাঠিসোটা নিয়ে ছাদে
উঠি ঠিকঠাক,
ভূত কোথা, ভুতো হাঁটে,
হলাম অবাক।
ভুতোর জবর সাজ
পায়ে পাম্পশু,
আমাদের দেখে সে-ই
ভয়ে পাংশু।
ভ্যাবাচাকা খেয়ে শেষে
বলে মুখপোড়া,
"শখ করে কিনি বাবু
জুতো একজোড়া।
দিনভর রাঁধিবাড়ি,
বাটনাও বাটি,
ফুরসত পাই কোথা,
জুতো-পায়ে হাঁটি ?
মাঝরাতে কিঞ্চিৎ
অবসর পাই
জুতো পরে তাই ছাদে
শখটা মেটাই।"

ছবি : দেবাশিস দেব

এখন!

প্রাকৃতিক গুণে ভরপুর

ভিক্স হার্বল বড়ি

এখন ভিক্স-এর নিজস্ব ঔষধি এবং প্রাকৃতিক ভেষজের এমনভাবে সমন্বয়সাধন হয়েছে যে গলার-কষ্টে তাড়াতাড়ি আরাম আনে। মুখে আনে এক অনন্য স্বাদ।

গলার পক্ষে উপকারী স্বাদেও অনন্য!

OBM/1655 BN/R

বাংলা বলো

য-ফলার আচরণ

কফি-টফি খাওয়া শেষ হলে ভণ্টু বলল, "কাকু, তুমি বলছিলে যে য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা— এগুলো শব্দের গোড়ায় থাকলে—"

হিগিনকাকু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "শুধু ব্যঞ্জনটারই উচ্চারণ হয়, ফলাটার হয় না। যেমন ধরো, য-ফলা। ব্যয় [ব্যায়], ব্যাখ্যা [ব্যাক্‌খা], খ্যাত [খ্যাতো],—এই সবগুলোতে শুধু 'ব' বা 'খ' শুনছি আমরা। য-ফলাটা 'অ্যা' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু য-ফলা-লাগানো ব্যঞ্জন শব্দের মাঝখানে থাকলেই তা ডবল হয়ে যাচ্ছে। যেমন, 'অখ্যাত' হচ্ছে 'অক্‌-খ্যাতো'। ব-ফলা, ম-ফলার বেলাতেও একই নিয়ম। 'শ্বাস' বলতে বলি 'শাশ্‌' কিন্তু 'বিশ্বাস' উচ্চারণ 'বিশ্‌-শাশ্‌'। 'স্মরণ' উচ্চারণে 'শঁরোন' কিন্তু 'বিস্মরণ' হল 'বিশ্‌-শঁরোন'। আর শুধু এই 'ত্রিফলা' কেন, 'ক্ষ' 'জ্ঞ'-এর ব্যবহারও অবিকল এক। 'ক্ষয়' বলছি 'খয়', কিন্তু 'অক্ষয়' উচ্চারণ করছি 'অক্‌-খয়', 'জ্ঞান' হল 'গ্যাঁন', কিন্তু

'বিজ্ঞান' উচ্চারণে 'বিগ্‌গ্যাঁন' বা 'বিগ্‌-গাঁন'। হল তো ?"

ভণ্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল বুঝেছে।

"তো এই হল গিয়ে ব্যাপার। য-ফলার সংস্কৃতে উচ্চারণ ছিল 'ইয়' গোছের—অন্তঃস্থ য-রই ছিল ঐ উচ্চারণ। বাংলায় আলাদা অন্তঃস্থ য-কে আমরা 'জ' উচ্চারণ করি। কিন্তু য-ফলা শব্দের গোড়ার 'অ্যা' আর গোড়ায় না থাকলে আগের ব্যঞ্জনকে ডবল করে নেয় প্রথমে। তারপর সঙ্গে কিছু না থাকলে হয় 'অ' বা 'ও', আ-কাঁর থাকলে হয় 'আ', হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈকার থাকলে হয় 'ই'। যেমন, খাতায় লিখে দ্যাখো—"

ভণ্টু খাতা খুলে শুনে শুনে লিখল

শব্দের গোড়ায়	*অন্যত্র*
ব্যয় [ব্যায়]	অব্যয় [অব্‌-বয়]
	কাব্য [কাব্‌-বো]
ব্যাহত [ব্যাহতো]	অব্যাহত [অব্‌-ব্যাহতো]
ন্যস্ত [ন্যাস্তো]	বিন্যস্ত [বিন্‌-নস্তো]
জ্যামিতি [জ্যামিতি]	প্রব্রজ্যা [প্রোব্রোজ্‌-জা]

"আর দুটো কথা মনে রাখতে হবে," হিগিনকাকু হাত তুললেন, "শুধু য-ফলা শব্দের গোড়ায় 'অ্যা', অন্য জায়গায় 'অ' বা 'ও'। য-ফলা আ-কার গোড়াতে 'অ্যা', অন্যত্র সাধারণ ভাবে 'আ'। এবার ভণ্টু, বাবা, বলো তো 'হ্য'-র আচরণ কীরূপ ?"

ভণ্টু ভেবে নিয়ে বলল, "পারব কাকু ! শব্দের গোড়ায় 'হ্যা' আর অন্যত্র 'জ্‌ঝ'। যেমন 'হ্যাদে', 'হ্যাঁচ্চো'। কিন্তু সহ্য [সজ্‌ঝো], দাহ্য [দাজ্‌ঝো]।" (ক্রমশ)

বাচস্পতি

সহজে ইংরেজি

কলকাতায় বোমা

অনেক বছর আগে জাপানিরা কলকাতায় বোমা ফেলেছিল। তখন পৃথিবী জুড়ে একটা মস্ত বড় যুদ্ধ চলছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। চম্বল আর চামেলির জন্মের অনেক দিন আগেকার ঘটনা সে-সব। তারা বাবার কাছে সেই গল্প শুনছিল।

"Did they drop very big bombs on Calcutta, Daddy?" Chameli asked.

Daddy said, "Not very big ones, Milly. In fact, the bombs were quite small."

"Did you see any falling?" Chambal asked.

"No, I didn't actually see any bombs falling. The raids were at night. On the morning after, many people came out to see the damage."

"What did you do when you heard the bombers coming. Did you hear them coming?"

"There used to be siren warning us that enemy planes were approaching. We took shelter."

"Did everybody do it? Take shelter, I mean."

"Not quite everybody. Many had to go about their business. Official business, that is. A.R.P. Wardens for example. They were responsible for air-raid precautions. Their organization was called A.R.P. They went about while the air-raid was actually taking place, risking their lives."

"What did they do that for ?"

"Oh, they had all sorts of duties. They had to help put out fires caused by bombs. When a building was damaged they had to help evacuate it. They had to attend to injured people. One of their most important duties was to see that the black-out was being strictly observed."

"What's black-out, Daddy," Milly asked.

"It meant that lights in the houses had to be covered and the windows screened so that no light shone out of the houses. That would make bombing difficult."

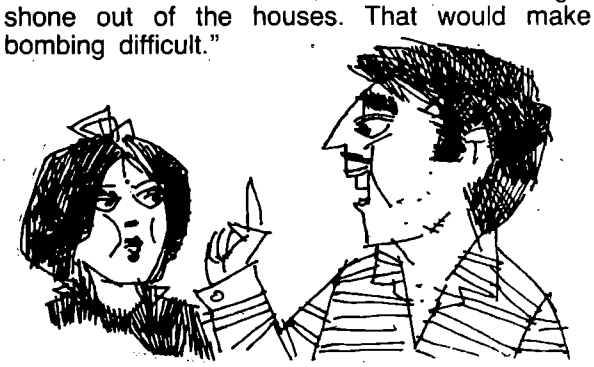

এবারে এই প্রশ্নবোধক বাক্যগুলো তোমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করতে বলছি, কেননা এ-রকম ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াপদটির দু'রকম ব্যবহারের ব্যাপারটা ভাল করে রপ্ত করা দরকার :

To Do
What did you do?
Did everybody do it?
What did they do it for?

প্রসাদ

তপেশবাবুর বিপদ

মীরা বালসুব্রমনিয়ম

ট্যাক্সির ড্রাইভারটি তপেশবাবুর দিকে ফিরে বলল, "যাচ্ছেন তো পশুপতি ? তাহলে বাঁয়ে মোড় নিই ?"

কী করবেন, চট করে ঠিক করতে পারলেন না তপেশবাবু। দার্জিলিং বেড়াতে এসেছেন ; সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে মিরিক। যাবার পথেও ট্যাক্সিওলা পশুপতিতে থেমেছিল কিছুক্ষণ। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্য। তপেশবাবু নেমে চা খেয়েছিলেন এক কাপ। চায়ের দোকানে বেজায় ভিড়, ট্যুরিস্টে গিজগিজ করছে ! তখনই তপেশবাবু জেনেছিলেন জায়গাটার মাহাত্ম্য। না, নাম পশুপতি বলে নয়, বা জায়গাটায় পশুপতিনাথের কোনো মন্দিরও নেই। এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়া আর নেপালের বর্ডার। বাঁ দিকের পথে আড়াআড়ি যে বাঁশ লাগানো রয়েছে, তারপর থেকেই নেপালের শুরু। একটুখানি নো-ম্যান'স্ ল্যাণ্ড বাদ দিয়ে অবশ্য। ইচ্ছে করলেই চলে যাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ানদের তো নেপালে যেতে পাসপোর্টও লাগে না।

ড্রাইভারটি তখনও মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। 'হ্যাঁ' বলে দিলেই হল। চট করে বাঁয়ে মোড় নেবে গাড়ি। বিনা আয়াসে বিদেশ-ভ্রমণ হয়ে যাবে।

তপেশবাবু ইতস্তত করছিলেন অন্য কারণে। পশুপতির আকর্ষণ কিন্তু জায়গাটা নেপালে বলে নয়। আকর্ষণ হল আধমাইলটাক দূরে তার বিখ্যাত বাজার—যেখানে বিদেশী জিনিসের ছড়াছড়ি। টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, শাড়ি, হাওয়াই চপ্পল, ছাতা, কী নেই সেখানে ! আর সব কিছুই কলকাতার তুলনায় 'ড্যাম চিপ'। লোভনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওভাবে জিনিস আনা আবার বে-আইনিও বটে।

ড্রাইভার আবার তাড়া লাগাল, "কী, বলুন কী করবেন ?"

তপেশবাবু বিরক্ত হলেন। কথাটা মুখ থেকে পড়তে না পড়তেই অমন চট করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় নাকি ? বললেন, "দাঁড়াও, অত তাড়া লাগাচ্ছ কেন ? গাড়িটা থামাও, চা খাই একটু—"

তারপর ড্রাইভারের ব্যাজার মুখ দেখে ওর দিকে একটা দু'টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও, চা খেয়ে এসো।" তারপর নেমে নিজেও হানা দিলেন চায়ের দোকানে।

আসলে চা'টা তেমন জরুরি নয়। তপেশবাবু চিন্তা করতে চাইছিলেন একটু। অর্থাৎ পশুপতির সেই চোরবাজারে যাবেন কি যাবেন না।

অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে ওঁর ওসব ঝামেলায় যাবার কোনো দরকার নেই। তপেশবাবু সরকারি কাজ করেন, মাঝারি অফিসার, আয় মন্দ নয়। ওঁর বাবা কিছু শেয়ার রেখে গিয়েছিলেন ; আর একটা বাড়ি যাতে চারটে ভাড়াটে। অবশ্য পুরনো। সব মিলিয়ে সচ্ছল অবস্থা ওঁর। বিয়ে-থা করেননি। ছবি তোলার শখ নেই, টেপরেকর্ডারের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও ভাসা-ভাসা আইডিয়া আছে মাত্র। এহেন তপেশবাবু বিদেশী জিনিস নিয়ে করবেনটাই বা কী ! তারপর রাস্তায় যদি কোথাও চেকিং-ফেকিং হয়, না না সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। মিরিক দেখতে এসেছিলেন, দেখা হয়ে গেছে, এবার মানে-মানে দার্জিলিং ফিরে যাওয়াই ভাল।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরে ওঁর মনটা একটু হালকা মনে হল। বেশি দুধ-চিনি দেওয়া কড়া লিকারের চা দু'ঢোকে শেষ করে আরেক কাপ অর্ডার দিয়ে দিলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে জুত করে বসে তাকালেন চারপাশে।

দোকানের খদ্দেররা প্রায় সবাই ট্যুরিস্ট। আর সবার মুখেই এক কথা। কী শস্তা সব বিদেশি জিনিস পশুপতির বাজারে !

তপেশবাবুর পাশেই বসেছিলেন এক দল। তাঁদের মুখেও একই আলোচনা। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন

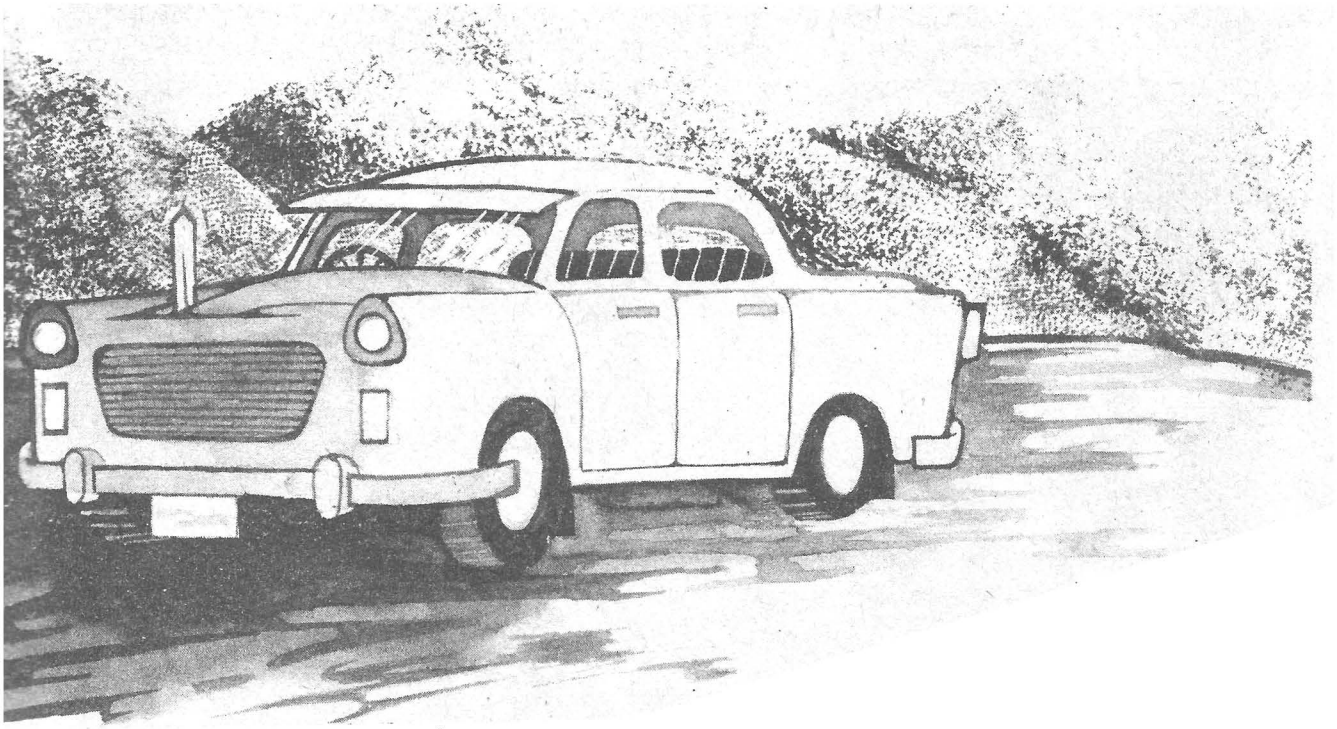

তপেশবাবু, "আচ্ছা, এভাবে জিনিস আনলে কাস্টম্‌সে ধরে না ?"

যাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বয়েসটা তিরিশের ওপারে নয়। একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন ভদ্রলোক, "চেকিং একটা হয় বটে মাঝে-সাঝে, তবে ওদের ফাঁকি দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। আমি তো মাঝে-মাঝেই যাই। সত্যি কথা বলতে কী, কাস্টমসের লোকদের ফাঁকি দেওয়ায় কেমন একটা থ্রিল আছে !"

"সেটা সত্যি," স্বীকার করলেন তপেশবাবু। মনে পড়ল, ওঁর সহকর্মী ও বন্ধুদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই বিদেশে গিয়েছেন ; হয় ছেলে নয় মেয়ের কাছে। আর ফিরে এসে রসালো ভাষায় বর্ণনা করেছেন। না, কী দেখে এসেছেন সে-সব নয়, কাস্টম্‌সকে ফাঁকি দিয়ে বা ওদের কাছে দরবার করে মন গলিয়ে কী কী বিদেশী জিনিস এনেছেন, তার। আর এইসব আলোচনায় কোনোদিন যোগ দিতে পারেননি তপেশবাবু। কারণ বিদেশেই উনি যাননি কখনও, কাস্টম্‌সকে ফাঁকি দিয়ে, জিনিস আনা তো দূরের কথা।

একবার বন্ধু-মহলে মিনমিন করে বলতে গিয়েছিলেন উনি, "ওভাবে জিনিস আনা কি ঠিক ? মানে, হাজার হলেও স্মাগলিং তো—"

তপেশবাবুর যে বন্ধুটি তাঁর বিদেশ-ভ্রমণ তথা বিদেশী জিনিস আনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তিনি একটু ব্যাজার মুখে বলেছিলেন, "স্মাগলিংয়ের কথা উঠছে কী করে ; আমি তো আর ব্যবসা করছি না, নিজেদের জন্য আনছি। কাস্টম্‌সের লোকেরাও জানে সে কথা। তবে ওদের চোখ এড়িয়ে জিনিস আনার একটা থ্রিল আছে। অবশ্য তুমি ওসব বুঝবে না, তপেশ।"

"তা সত্যি," অন্য বন্ধুরাও একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, তপেশের জীবনটা আগাগোড়া ছক-বাঁধা। থ্রিল-টিলের জায়গা কোথায় সেখানে ?

এরপর সবাই যেভাবে ওঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, সেটাকে কৃপাদৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

তাই পাশের ভদ্রলোকের 'থ্রিল' কথাটায় হঠাৎ সব কিছু মনে পড়ে গেল তপেশবাবুর ও মনের একটা লুকোনো ব্যথা হঠাৎ চিনচিন করে উঠল। সেই মুহূর্তেই এল চায়ের দ্বিতীয় পেয়ালা। গরম গরম চায়ে চুমুক দিয়েই কিন্তু ওঁর মগজটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এবং উনি বুঝতে পারলেন যে, পশুপতির বাজারে গেলে ওঁর যে শুধু বিদেশ-ভ্রমণই হবে তা নয়, কাস্টম্‌স্‌কে ফাঁকি দিয়ে বিদেশী জিনিসও আনতে পারবেন। অবশ্য চারপাশে কোথাও চেকিং পার্টির টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে কাস্টম্‌স্‌কে এড়ানোর শ্বাসরোধকারী বর্ণনা দিলে বাধা দিচ্ছে কে ?

চায়ের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এলেন তপেশবাবু। ড্রাইভারটিকে বলতে ও খুশি মুখে গাড়িতে স্টার্ট দিল আর বলল, "পশুপতি গেলে আরও দশটাকা বেশি লাগবে।"

"ঠিক আছে।"

ড্রাইভারটিই বর্ডারের সেপাইকে বলে আড়াআড়ি রাখা বাঁশটা খুলিয়ে নিল। তারপর গাড়ি চালিয়ে দিল। তপেশবাবু মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে লাগলেন। যদিও ইণ্ডিয়ার সঙ্গে নেপালের তফাত কিছু বুঝতে পারলেন না। লোকেরা 'বিদেশ বিদেশ' করে এত লাফায় কেন কে জানে।

একটু পরেই এসে গেল সেই জায়গা, যেখান থেকে পায়ে-হাঁটা পথে খানিকটা গিয়ে সেই বিখ্যাত বাজার। অনেক ট্যুরিস্ট হেঁটে চলেছে বাজারে। তপেশবাবুও তাদের সঙ্গ ধরলেন। ট্যাক্সির ড্রাইভারটি শুধু বলে দিল আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে।

কিন্তু বাজারে গিয়ে বেশ হকচকিয়ে গেলেন তপেশবাবু। এত জিনিস ! যেসব ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার বিক্রি হচ্ছে, তার

নামই কখনও শোনেননি উনি। ওসব কেনার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া হাতে অত টাকাও নেই। শাড়িই বা কিনবেন কার জন্যে ? ওঁর এক বোন অবশ্য আছেন, কিন্তু উনি গিন্নিবান্নি ধরনের শাড়িই পছন্দ করেন, এসব মাকড়সার জালের মতো ফিনফিনে শাড়ি নয়। অনেক ভেবেচিন্তে নিজের জন্য একজোড়া হাওয়াই চপ্পল কিনলেন তপেশবাবু, যার গদিটা মাখনের মতো নরম। আর ছোট ভাগ্নিটির জন্যে কিনলেন একটা লেডিজ ছাতা। ব্যাস্।

ওঁকে ফিরতে দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, "এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ?" তারপর ওঁর হাতের ছাতাখানা দেখে বলল, "ঐ পাশের ঝোপটায় গিয়ে ওপরের প্লাস্টিকের মোড়কটা ফেলে আসুন।"

"কেন ?"

"কাস্টম্স্ থেকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনার ব্যবহার করা ছাতা। সবাই তাই করে। আপনার সঙ্গে তো অন্য ছাতাও নেই।"

মোড়কটা ফেলতে গিয়ে তো তপেশবাবুর চক্ষুস্থির। ঝোপের পাশে স্তূপীকৃত হয়ে আছে ছাতার মোড়ক। এত ছাতা পাচার হচ্ছে এভাবে ?

মোড়ক ফেলে ছাতা আর জুতোজোড়া নিয়ে ট্যাক্সিতে আরাম করে বসলেন তপেশবাবু। একটু পরেই নেপাল ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় এসে পড়ল ট্যাক্সিটা, আর তপেশবাবুর বিদেশ-ভ্রমণও শেষ হল। উনি অবশ্য ভাবছিলেন বন্ধুমহলে গিয়ে কীভাবে ফলাও করে বর্ণনা দেবেন সবকিছুর। সবকিছুকে বেশ থ্রিলিং করে। আর ওঁর কল্পনার সুবিধের জন্যেই হয়তো চারদিক হঠাৎ কুয়াশায় ঢেকে গেল। ড্রাইভার বেচারা হেডলাইট জ্বালিয়ে খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল, আর জানালার কাঁচ উঠিয়ে তপেশবাবু সেই কুয়াশার রহস্যময়তা উপভোগ করতে লাগলেন।

হঠাৎ শোনা গেল একটা বাজখাঁই আওয়াজ, "হল্ট্ !" আর কুয়াশা ভেদ করে উদয় হলেন খাকি ইউনিফর্মধারী তিন মূর্তি। ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। তপেশবাবু হকচকিয়ে বললেন, "কী, কী ব্যাপার ?"

"কাস্টম্স্ চেকিং," বলে ড্রাইভার সিগারেট ধরাল একটা।

"কাস্টম্স্ চেকিং ?" জানালার কাচ নামিয়ে ব্যাপারটা দেখতে চাইলেন তপেশবাবু। হ্যাঁ, তাই বটে। কুয়াশা একটু পাতলা হতে দেখতে পেলেন, চার-পাঁচটা ট্যাক্সি, প্রাইভেট-কার আর জিপ দাঁড়িয়ে। জায়গাটা কাস্টম্স্ ইন্স্পেক্টর আর পুলিশে গিজগিজ করছে। রাস্তার পাশে গোটা কয়েক সুটকেস আর পোঁটলা আধখোলা পড়ে আছে। একটু গলা বার করে দেখতে পেলেন তপেশবাবু, চায়ের দোকানের সেই 'থ্রিল'-লাগা ভদ্রলোক হাত জোড় করে দুজন ইন্স্পেক্টরকে কী সব বোঝাচ্ছেন আর ওঁর পায়ের কাছে একটা খোলা সুটকেস, তাতে নিদেনপক্ষে পাঁচ-পাঁচখানা ক্যামেরা।

তপেশবাবুর প্রথমটা মনে হল, যাক্, কাস্টম্স্ চেকিংয়ের ব্যাপারটা আর বানাতে হবে না ওঁকে। ভাবলেন ভালই হল, বানানো-টানানো একদম আসে না ওঁর।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, ওঁর গাড়িও চেকিং হবে, এবং স্মাগ্ল্ড্ গুডস্ দুটো, অর্থাৎ লেডিজ ছাতা ও নিজের হাওয়াই চপ্পল হাতের কাছেই রয়েছে। এগুলো লুকোবার জন্য একটা বাক্সও ওঁর সঙ্গে নেই। অর্থাৎ ইন্স্পেক্টরেরা ওঁর দিকে একবার দৃষ্টি দিলেই ওঁর হাতে হাতকড়া পড়বে নিশ্চিত। তারপর ? খবরের কাগজে হেডিং 'সরকারি অফিসার চোরা-চালানের দায়ে গ্রেপ্তার,' আদালতে মামলা, চাকরি থেকে সাস্পেনশন, পরে বরখাস্ত, সব কিছুই মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন উনি, এবং এই ঠাণ্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামতে লাগলেন।

সামনের সিটে বসে ড্রাইভারটি সিগারেট টানছিল, তপেশবাবুর দিকে তাকিয়ে ওঁর পাংশু মুখখানা দেখে বলল, "আপনি ভাবছেন কেন ? গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। দার্জিলিং পৌঁছতে একটু দেরি হবে, এই যা।"

বসে রইলেন তপেশবাবু, তবে গ্যাঁট হয়ে নয়। মনে হল, উনি যেন কাঁটার ওপর বসে। যেখানে যত দেবদেবী আছেন, সবার কাছে মানত করে চললেন। আর মুণ্ডুপাত করতে লাগলেন সেইসব বন্ধুদের, যাঁদের মৃদু টিটকারিতে 'থ্রিল' অনুভব করতে গিয়েছিলেন আজ। ওঁরাই এই অঘটনের জন্য দায়ী। নয়তো ওঁর কোনো দরকার ছিল না লেডিজ-ছাতা বা হাওয়াই চপ্পল কেনার, আর কখনও এমনটি করবেন না উনি। হে মা-কালী, বাঁচিয়ে দাও এ-যাত্রা।

তপেশবাবু লোক ভাল, তাই মা-কালী ওঁর প্রার্থনা শুনলেন। ওঁর ট্যাক্সির পালা আসতে একজন ইন্স্পেক্টর খট করে গাড়ির দরজা খুলে হাওয়াই চপ্পল আর ছাতা (ওগুলো সামনেই রেখেছিলেন তপেশবাবু) দুটো একটু নেড়েচেড়ে দেখে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে একটা আওয়াজ করলেন মুখে, যেটা তপেশবাবুর কানে শোনাল, "গো !" পেছনের ডিকিটা একবার খোলার আওয়াজও পেয়েছিলেন উনি। তবে ওঁর কান যে ঠিকই শুনেছে তা বুঝলেন, যখন ড্রাইভারটি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এল।

"গা-গাড়ি চালিয়ে দিলে যে ?" ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন তপেশবাবু।

"আমাদের যেতে বলল তো ? অর্থাৎ অল ক্লিয়ার। আপনাকে বলেছিলাম না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন আপনি ? তা, মিছিমিছিই ভয় পেলেন।"

ড্রাইভারের গলার তাচ্ছিল্যের আভাসটুকু উপেক্ষা করে তপেশবাবু বললেন, "কী করে জানব কিছু হবে না ?"

"আরে, আপনি তো কিনেছেন মাত্র একজোড়া জুতো আর একটা জাতা। এটুকু জিনিসের জন্য হয়রানি করে না ওরা। কাস্টম্সের লোক হলেও ওদের হৃদয় আছে, বুঝলেন ? ওরা রুই-কাতলার খোঁজে থাকে। আপনার মতো চুনোপুঁটির নয়।"

বিপদ কেটে গেছে। ইন ফ্যাক্ট, বিপদের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। খুশি হওয়া উচিত ছিল তপেশবাবুর। তবু ঠিক খুশি হতে পারলেন না উনি। বিপদ কেটে গেছে সত্যি, কিন্তু থ্রিলের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। অর্থাৎ বন্ধুদের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে একটা উত্তেজনাকারী গল্প ফাঁদতে হবে ওঁকে। মুশকিল হচ্ছে যে, বানাতে উনি একদম পারেন না। অথচ সত্যি কথাটাও বন্ধুদের বলা চলবে না কিছুতেই। ট্যাক্সিটা দার্জিলিংয়ের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটে চললেও তপেশবাবুর মনে মন-খারাপের একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

ধাঁধা

সেদিন ছোটকাও দেখি খুচরোর ব্যাপারে চিন্তিত। যে মাটির ভাঁড়ে খুচরো পয়সা জমাত ছোটকা, সেদিন সাতসকালেই দেখি সেটা ভেঙে ফেলেছে। ছড়ানো পয়সা চারদিকে। ছোটকা গুনে গুনে তুলছে। কী ব্যাপার ? না অফিসের ট্রেজারারকে দিতে হবে।

আর যতদূর মনে হয়, তখনই মনে-মনে একটা ধাঁধা বানিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, খুচরো পয়সা নিয়েই তৈরি ধাঁধাটা। আর সেটাই এবারে দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ সুকুমারবাবু এক অফিসের ট্রেজারার। সকলের মতো তিনিও খুব চিন্তিত খুচরো পয়সার আকাল নিয়ে।

সেদিন সকালে অফিসের ক্যাশ কাউন্টারে বসেছেন সুকুমারবাবু। খুচরো পয়সা গুনে নিয়েছেন, কাউন্টারে বসার আগে। যাবতীয় খুচরো পয়সা যোগ করে হয়েছে এক টাকা পনেরো পয়সা।

এমন সময় বড়সাহেব স্বয়ং এলেন সুকুমারবাবুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "একটা টাকা ভাঙিয়ে দেবেন সুকুমারবাবু ?"

সুকুমারবাবু খুচরোগুলো একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "এক টাকার ভাঙানি তো দিতে পারছি না স্যার।"

বড়সাহেব বললেন, "কত খুচরো আছে ?"

সুকুমারবাবু বললেন, "এক টাকা পনেরো পয়সার আছে স্যার। কিন্তু এতে না যাবে টাকা ভাঙানো, না যাবে আধুলি ভাঙানো, এমন-কী সিকিও ভাঙানো যাবে না।"

বড়সাহেব অবাক। সে আবার কী ? বললেন, "কী করে হয় ? কই দেখি, কী রয়েছে ?"

সুকুমারবাবু তখন ক্যাশে রাখা যাবতীয় খুচরো বড়সাহেবের সামনে তুলে ধরলেন। হিসেব করে দেখলেন বড়বাবু, সুকুমারবাবু ঠিকই বলেছেন। টাকা, আধুলি বা সিকি ভাঙানো যায় না।

সুকুমারবাবুর কাছে খুচরো ছিল পাঁচটি মুদ্রায়। এ থেকে বলতে পারো, কী-কী মুদ্রা ছিল তাঁর কাছে ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ইংরেজি পাঁচটি অক্ষর মধ্যে বসিয়ে একটা চেনা শব্দ তৈরি করো—

UND.....UND

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

লামালসম

গতবারের উত্তর ॥ (১) লালির সঙ্গে সাদা শাড়ি পরা মেয়ের কথা হয়েছে, সুতরাং সে নিজে সাদা শাড়ি পরেনি। তার লাল শাড়ি পরার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং লালির শাড়ির রঙ নীল। শ্রীমতী নীলা ও শ্রীমতী শুভ্রা বাকি রইল, শাড়ি রইল লাল ও সাদা রঙের। শুভ্রা সাদা পরবে না, তাই তার শাড়ির রঙ লাল। নীলার শাড়ি সাদা রঙের। (২) ভুল। একবিংশ শতাব্দী শুরু হবে ১ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে। (৩) লবঙ্গলতিকা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

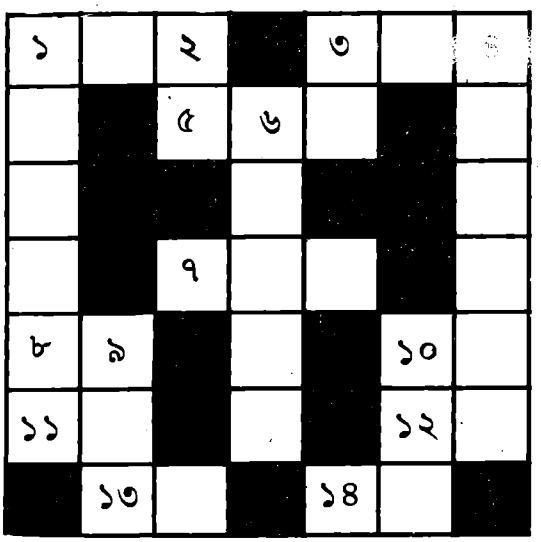

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ধারবাকির বিপরীত। (৩) বেগুন। (৫) বিক্রমাদিত্যের আর-এক নাম। (৭) সেলাইফোঁড়াই। (৮) উৎকৃষ্ট। (১০) একটাই শব্দ সে, একাধিক মানে/পায়রার আগে থাকে, থাকে কামানে। (১১) একজন ডাকসাইটে ভারতীয় সাহেব। (১২) সখী। (১৩) দর্শনে লগুড়, রসে চিনিগুড়। (১৪) যে পাখি ছোঁ মারে। উপর-নীচ : (১) উৎসব উপলক্ষে যেখানে বাজনার আসর বসে। (২) কথায় লেখো : দুই অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা। (৩) জল। (৪) সুস্বাদু ঠাণ্ডা খাবার। (৬) কোন্ চিনি ঝাল ? (৯) বাঁশিবিশেষ। (১০) স্নান।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মজার খেলা

এটা আসলে খুব ছোটদের খেলা। তাদের বুদ্ধি আর অঙ্ক-ভালবাসার একটা ছোট পরীক্ষা বলা যায়।

নীচের ছবির মতো একটা ক্ষেত্র এঁকে মধ্যে লাইন টেনে ষোলটা খোপ করে দাও।

১	১	১	২

একদম ওপরের ঘরে তিনটে এক ও একটা দুই লিখে দাও। যেমন ছবিতে দেখানো রয়েছে।

এবার কোনো ছোট্ট বন্ধুর সামনে এটা রাখো। তাকে বলো, এক অথবা দুই এ দুটো সংখ্যা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে সে যেন বাকি খোপগুলোতে এমনভাবে বসায়, যাতে কিনা লম্বালম্বি, পাশাপাশি বা কোনাকুনি যে-কোনো দিক থেকেই যোগ করা হোক না কেন, যোগফল প্রতিবার হবে পাঁচ। প্রথম লাইনটা তুমি করে দিয়েছ, এর পাশাপাশি যোগফল, পাঁচ। এবার বাকিগুলোয় সে বসাবে।

ছোট্ট বন্ধুদের খেলা এটা। তাই সে না পারলে তোমাকে করতে হবে। কিন্তু তুমিও যদি না পারো, তখন ?

সেই লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা সমাধান নীচে দেওয়া হল। নিজে পারলে আর এটা দেখবে কেন ?

১	১	১	২
১	২	১	১
২	১	১	১
১	১	২	১

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ এ কী, দুটো স্ক্রু মাটিতে পড়ে আছে কেন ?
উঃ আপনার মাথার ঢিলে দুটো কখন খুলে পড়েছে।

প্রঃ সিংহের সামনে পড়লে কী করতে হয় জানো ?
উঃ বিখ্যাত শিকারির বইতে পড়েছি যে, সিংহের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে না, কিন্তু সিংহ যদি বইটা না পড়ে থাকে !

প্রঃ হাতি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পেলে খুব খুশি হতেন বলছেন, হাতি দিয়ে কী করবেন।
উঃ হাতি কিনব কে বললে, আমার টাকাটা পেলেই হবে।

সুসেন

হাসিখুশি

"রবীন্দ্রনাথ আমার চেয়ে মাত্র একদিনের বড় ছিলেন।"
"কিন্তু তুমি তো মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ো।"
"তাতে কী হয়েছে ? আমি যে ছাব্বিশে বৈশাখ জন্মেছি।"

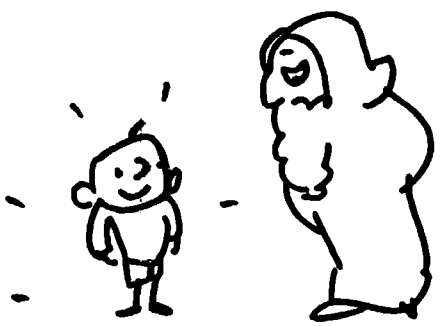

"কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম আমি তাজমহলটা বিক্রি করে দিচ্ছি।"
"তাতে অসুবিধা কোথায় ?"
"আরে, সেটা যে তোমাকেই বিক্রি করতে যাচ্ছিলাম।"

"আচ্ছা, রমেশবাবু, কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সত্যিই কি বাঁদর ছিল ?"
"সে তো আপনি আয়নাতে আপনার মুখ দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

"আপনি দোষী না নির্দোষ ?"
"নির্দোষ।"
"আগে কখনও জেলে কাটিয়েছেন ?"
"না; না। এই তো প্রথমবার চুরি করলাম।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

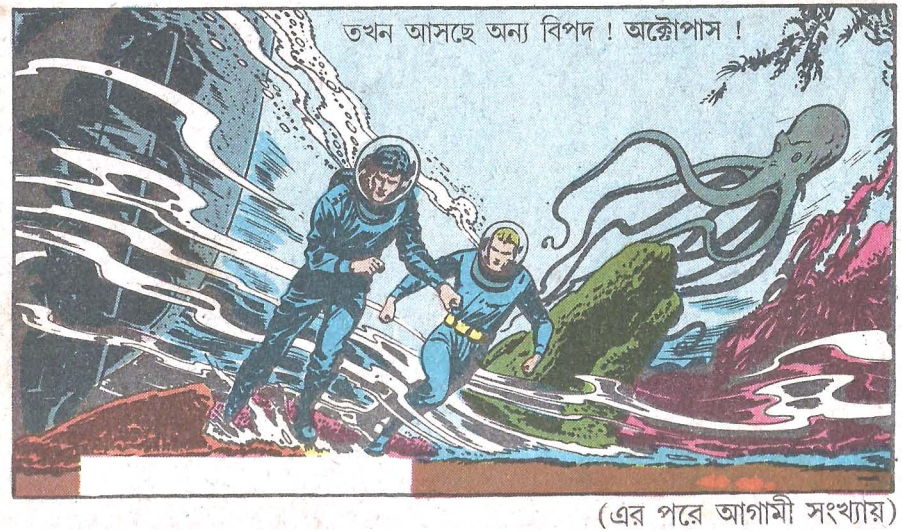

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
লিগের শেষ খেলায় রোভার্স জয়ী। এবারে উয়েফা কাপের ফিরতি-খেলা, হেকলাভিকের বিরুদ্ধে কিন্তু ক্লাবের দুজন খেলোয়াড় অসুস্থ ...
ভীষণ যন্ত্রণা !
মার্ভিন আর প্যাকো অসুস্থ ! শিগগির ডাক্তার ডাকো
আমারও মাথা ঘুরছে !
চার্লি !
ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগে ভার্ননও অসুস্থ !
ব্যাপার কী ডাক্তার ?
বুঝতে পারছি না...
হাসপাতালে নিতে হবে ...
মনে হচ্ছে, ফুড পয়জনিং !
ঠিক ! আজ লাঞ্চের সময় কেউ-কেউ ...
"বলেছিল বটে যে, মাংসের স্বাদটা কেমন অদ্ভুত ..."
তাহলে উপায় ?
ধৈর্য ধরো ! সবাই যে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এমন-কোনো কথা নেই !
সেই রাত্রে ... হাসপাতাল থেকে ফিরে ...
কেমন আছে ওরা ?
প্রাণে বেঁচে গেছে !
কিন্তু আইসল্যাণ্ডে যেতে পারবে না !

তার উপরে আবার ডাক্তার বললেন, দেরিতেও কেউ-কেউ অসুস্থ হতে পারে !

দু'দিন বাদে, ট্রেনিংয়ের সময় ...

উঃ !

কী হল জিওফ ? বলটা ধরো !

পেটে ভীষণ যন্ত্রণা !

সর্বনাশ !

খবরটা বেতারে প্রচারিত হচ্ছে ...

রোভার্সের পাঁচজন খেলোয়াড় এখন হাসপাতালে ...

অথচ কালই তাদের আইসল্যাণ্ডে যাবার কথা !

খেলা মুলতুবি রাখা দরকার !

রয় টেলিফোন করছে ফিফা-কর্তৃপক্ষকে, কিন্তু ...

ওরা তারিখ পিছোতে রাজি নয় !

হুম্ !

চার্লির বদলে স্যাণ্ডি খেলবে । বাকি বদলি এইরকম ...

চার্লি/স্যাণ্ডি
ব্যাক্সটার
গ্রে
মার্ভিন/ক্যাসিডি
এলিয়ট/এডওয়ার্ডস
গাইল্স/ডিক্সন
ডিয়াজ/কেলান্
হলোয়ে
রেস

ট্রেভার ক্যাসিডি খেলবে, এটাই বাঁচোয়া !

পরদিন, এয়ারপোর্টে ...

স্যাণ্ডির বয়স মাত্র আঠারো !

তাতে কী , দেখো, চার্লির চেয়ে কম যাবে না !

AIRPO

DEPARTURES

জিতে ফেরা চাই !

দারুণ খেলতে হবে !

হারিয়ে দেওয়া চাই !

ঠিক সেই মুহূর্তে ...

কী হল রয় ?

কী হল ?

কী জানি !

মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা ! উঃ !

কী হল রয়ের ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

লটারির টিকিট

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিমল কর

ভাঙা আয়না, ফাটা কাপ আর শুকনো সজনেডাঁটার মতন এক ব্রাশ সামনে নিয়ে বিজন দাড়ি কামাতে বসেছিল। ব্লেডটাও পুরনো, ভোঁতা মেরে গিয়েছে। বিজনকে বেশ মেহনত করেই দাড়ি কামাতে হচ্ছিল। তিন দিনের জমা দাড়ি তো কম নয়

দাড়ি কামানোর ব্যাপারে বিজনের যত আলস্য তত বিরক্তি। সে দু-চার বার দাড়ি রাখার চেষ্টা করে দেখেছে গোল মুখে দাড়িটা মোটেই মানাচ্ছে না। বন্ধুরা যা-তা বলছে। অগত্যা দাড়ি রাখার ব্যাপারে সে আর মাথা ঘামায়নি।

বিজনের ধাত হল আয়েসি। ভীষণ অলস। তাকে বিশ্বকুঁড়ে বললে বেশি বলা হয় না। গা-গতর যেটুকু নাড়ালে নয় তার বেশি নাড়াতে চায় না। মজা করে বলে, 'আমার তো তেলবাদশার নাতি হয়ে জন্মানোর কথা, ভুল করে এখানে জন্মে গিয়েছি। ভগবান মাঝে মাঝেই আমায় স্বপ্ন দিয়ে বলে দেন; বৎস বিজু, কিছু মনে কোরো না, আমার কারখানায় তো কম্পিউটার নেই, একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। কোথায় তুমি আমির-বাদশার ঘরে জন্মাবে —তা না গিয়ে জন্মালে বাঁশবেড়েতে। আসছে-বার আর এ-ভুল হবে না। তোমার এ-জন্মের দুঃখ আসছে-জন্মে শোধ করে দেব সুদে আসলে।'

বিজনের অবশ্য তেমন কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। অক্রূর দত্ত লেনের এক মেসবাড়িতে থাকে, চাকরি করে কলকাতা কর্পোরেশনের টিকসই দপ্তরে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারে দিনে বারো ঘণ্টা, আর যখন একা থাকে—মেসের বিছানায় শুয়ে বাঁশি বাজায়। এসবের বাইরে যদি কিছু থাকে তবে সেটা হল বিজনের মাছ ধরার শখ। কখনো-সখনো বিজন সঙ্গী জুটিয়ে কলকাতার বাইরে মাছ ধরতে যায়।

আজও দুপুরে বিজনের কলকাতার বাইরে যাবার কথা। দু-তিন বন্ধু মিলে যাবে মধ্যমগ্রাম। সেখান থেকে মাইল-দুই ভেতরের এক গ্রামে রাতটা কাটাবে ; কাল সকাল থেকে বসবে মাছ ধরতে, বিকেলে ফিরবে আবার কলকাতা।

দাড়ি কামাতে কামাতে বিজন মধ্যমগ্রামের কথা ভাবছিল। হঠাৎ তার কানে গেল, নীচে একটা বীভৎস কান্নার রোল উঠেছে। ডাক ছেড়ে, আকাশ ফাটিয়ে কান্না বললে যেমন বোঝায় অনেকটা সেই রকম। কান্নার সঙ্গে যে-কথাগুলো ভেসে আসছে তা বোঝাই যাচ্ছে না।

বিজন দাড়ি কামানো বন্ধ করে কান পেতে রাখল। হল কী ? কলকাতায় আছাড় খেয়ে পড়ে কারও মাথা ফাটল ? পেনুঠাকুর গিরিধারীর গলা কুপিয়ে দিল নাকি ? না বড়ালবাবুর কিছু হল ?

বিজন উঠব কি উঠব না ভাবছিল। দাড়ি কামানোর আর সামান্য বাকি।

বিজনকে উঠতে হল না, হরিদা ঘরে এলেন। হরিদার স্নান শেষ। খিদিরপুরে ছুটতে হয়। দশটায় হাজিরা না দিলেই নয়, অফিস বড় কড়া।

হরিদা বললেন, "আমি কালকেই বলেছিলাম, ও বাবা পেনু, টিকিটটা সাবধানে রাখিস। বরাতে একবারই জুটে গিয়েছে। ছিলি রাখাল, হয়ে গিয়েছিস রাজা। হাতছাড়া করিস না টিকিটটা, করলেই ডুববি, মারা পড়ে যাবি। তাই হল শেষ পর্যন্ত !"

বিজন খানিকটা আঁচ করতে পারল। তাদের মেসের পেনুঠাকুর লটারিতে দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছে। এটা কালকের খবর। কাল মেসে হইহই কাণ্ড, পেনুঠাকুর লটারিতে টাকা পেয়েছে। দু-একশো নয়, লাখ-দেড়েক। মেসের সকলে মিলে পেনুকে বাহবা দিচ্ছে, তামাশা করছে তাকে নিয়ে, কেউ কেউ বা পেনুর হস্তরেখা ছক বিচার করছে, কেউ বা পেনুকে উপদেশ দিচ্ছে—টাকাটা হাতে পেলে কীভাবে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত !

পেনুকে কাল কেমন থমকে যাওয়ার মতন দেখাচ্ছিল। লটারিতে টাকা পেয়ে একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছে। না পারছে হাসতে, না কাঁদতে ; বিশ্বাস করতে পারছে আবার পারছে না ; এই একেবারে চুপ, তারপরেই বিড়বিড় করছে। পেনুর অবস্থা দেখে চাটুজ্যেদা এক ডোজ হোমিওপ্যাথি গুলি খাইয়ে দিল।

সন্ধের দিকে পেনু খানিকটা ধাতস্থ হয়ে কালীবাড়িতে পুজো দিতে ছুটল।

পেনু এই মেসবাড়ির তিন নম্বর গার্জেন। এক নম্বর গার্জেন হলেন বড়ালবাবু। বড়ালবাবু উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে এই মেসবাড়ির পত্তন করেন, বড়ালবাবু আর মানিকদা। পেনু আসে পঞ্চাশ সালে। তার আগে বলরাম না কে যেন ছিল। কাজেই বড়ালবাবু আর মানিকদার পর তিন নম্বর হল পেনু। পেনু যখন বড়ালবাবুর কাছে আসে তখন তার বয়েস ছিল পনেরো বড়জোর। এখন পঞ্চাশ পার করে দিয়েছে। ছোকরা বয়েসে শিয়ালদায় চায়ের দোকানে চাকরি করত পেনু। বড়ালবাবু তাকে ধরে এনে ভাত ডাল মাছের ঝোল করতে শেখায়। চড়-চাপড়ও কম খায়নি পেনু বড়ালবাবুর কাছে। তা এ-সব পুরনো কথা বলে লাভ নেই, আসল কথাটা হল, পেনু হুট করে লটারির টাকা পাওয়ায় বড়ালবাবুর ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানিকদা আজকাল আর মেসে থাকেন না, কাছাকাছি এক ভাড়াবাড়িতে থাকেন, তবে দিনের মধ্যে ছ-সাত ঘণ্টা মেসে এসেই বসে থাকেন। মানিকদা নাকি পেনুকে বলেছিলেন, 'আজকাল জাল টিকিটের ছড়াছড়ি চলছে, পেনু। তোরটা জাল না আসল আগে দেখতে হবে। আমাকে দিস—দেখিয়ে নেব।'

বিজন মানিকদাকে কোনো দোষ দিচ্ছে না, কিন্তু টিকিটটা জাল হতে পারে শুনে পেনু যেন কেঁদেই ফেলেছিল। মানুষকে এভাবে কেউ ঘাবড়ে দেয় ! অবশ্য মানুষ মানুষই, তার দোষগুণ দুই থাকবে। মেস-বাড়ির ঠাকুর পেনু লটারিতে দেড় লাখ টাকা পাওয়ায় কার না বুকে কমবেশি লেগেছে। বড়ালবাবু থেকে শুরু করে গজুবাবু পর্যন্ত সকলেরই। এমনকি বিজন, যার চালচুলো নেই, খাই দাই আড্ডা মারি করে দিন কাটাই, তার পর্যন্ত কেমন একটা খিচ লেগে গেল।

হরিদার কথায় বিজনের যেন অন্যমনস্কতা কাটল।

"পেনু একটা গাধা। গাধা না হলে কেউ হাতের মুঠো আলগা করে দেড় লাখ টাকা জলে ফেলে দেয় !"

বিজনের দাড়ি কামানো শেষ। এবার সব খেয়াল করতে পারছে। কেন যেন হঠাৎ একটু বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিল।

"টিকিট হারাল কেমন করে ?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

"পেনুই জানে। এক-একবার এক-এক রকম বলছে। এখন আর পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে বুক চাপড়ে কেঁদে কী হবে ! তখন তো ভাল কথা কানেই তুলল না।"

বিজন গালের ওপর হাত বোলাতে লাগল। আজকালকার ব্লেডগুলো একেবারে বাজে। দুবার গালে তুললেই তার জান খতম হয়ে গেল। নিজের গাল দেখে বিজনের মনে হল, খুব একটা সাফসুফ হয়নি। চলে যাবে এই পর্যন্ত।

উঠে পড়ল বিজন আয়না ব্রাশ সেফটি রেজার নিয়ে। হরিদার ধুতি গেঞ্জি পরা শেষ, চুল আঁচড়ানোও হয়ে গিয়েছে। এবার খেতে যাবেন।

বিজন বলল, "মানিকদা নীচে নেই ?"

"মানিক মিত্তির আর বড়ালবাবু মিলে ঘোঁট পাকাচ্ছে।"

"কিসের ঘোঁট ?"

"কে জানে ! দুটোই তো সমান।···তুমি যাই বলো বিজন, যাদের কানের লতি কাটা হয় তাদের আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। মানিক মিত্তিরের কান দেখলেই লোকটাকে পয়লা নম্বরের ধান্ধাবাজ বলে মনে হয়।"

বিজন হেসে ফেলল। হরিদার কথাবার্তাই এইরকম। মনুষ্যচরিত্র বিচারের ব্যাপারে হরিদার এক ধরন আছে : কার কান ছোট, কার কান খাড়া, কার চোখ বেশি লাল, কার কপাল চেটালো, কার নাক উঁচু—এই সব দেখে মানুষের স্বভাব বিচার করেন হরিদা। বিজনকে বলেন, তুমি হলে গবা-গোবিন্দ, তোমার কিছু হবে না।

হরিদা আর দাঁড়ালেন না, নীচে চলে গেলেন।

নীচে তখনও রইরই চলছে।

বিজন খানিকটা পরে নীচে নামল। স্নানের জন্যে তৈরি হয়ে।

নীচে নেমে দেখল, তখনও পেনু-পর্ব থামেনি। উঠোনে দাঁড়িয়ে অখিলদারা টিকিট হারানো নিয়ে কথা বলছেন। পেনু বারান্দার একপাশে বসে আছে, খালি গা ; চোখমুখ বসে গেছে তার। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছে তাকে।

উঠোনে তিনজন। দত্তবাবু, অখিলদা আর মেজোবাবু। দত্তবাবু বড়বাজারের এক বাঙালি ব্যবসাদারের গদিতে কাজ করেন, অখিলদা হলেন বুকিং ক্লার্ক, চৌরঙ্গিপাড়ার এক সিনেমা হাউসে টিকিট বিক্রি করেন, মেজোবাবুর স্টল আছে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে।

দত্তবাবু বলছিলেন, "পেনু, তুমি বরং একটা কাজ করো। মলঙ্গা লেনে একজন আছে বাটি চালতে পারে। তাকে ধরে নিয়ে এসো।"

অখিলদা বললেন, "রাখো তোমার বাটি-চালা। ওসব বুজরুকি গাঁয়ে চলে, কলকাতা শহরে বাটিচালা, চালপোড়া চলে না। কেন তুমি ওকে বাজে ব্যাপারের মধ্যে যেতে বলছ, দত্ত ! ধোঁকাবাজিতে কাজ হয় না।"

মেজোবাবু সামান্য তোতলা, তিনি বললেন, "চু-চু চুরি, আর ইয়ে কি-কিনা হা-রানো—এক জিনিস নয়। হা-হারানো জিনিসের খোঁজ কড়িচালায় পাওয়া যায়।"

"কড়িচালা ? সেটা কী ?"

"কালীঘাটে একজন আছে। মন-মন্তর পড়ে ক-কড়ি চালে। বত্তি-বত্তিরিশ টাকা নেয়। গুণী লোক।"

"হ্যাত, যত্ত স রদ্দি ব্যাপার," অখিলদা বললেন, "কড়িচালা ! বত্রিশ টাকা নেয়। এম· ডি· ডাক্তারের ভিজিট। না পেনু, তুমি একেবারে এসবের মধ্যে যাবে না। অনর্থক ছুটোছুটি, প সা খরচা, ফালতু তোমায় নাচাবে।··· তুমি আবার সব খুঁজে দেখো ঘরের, তোমার বাক্স-প্যাঁটরা তন্নতন্ন করে খোঁজো। না পেলে থানায় চলে যাও।"

"থানা !··· তুমি কি পাগল নাকি অখিল ? থানা কি মামার বাড়ি যে যা খুশি আবদার করা যায় !" দত্তবাবু নাক কুঁচকে বললেন।

"কেন, যাবে না কেন ! চুরি গেলে লোকে থানায় ডায়রি করাতে যায় না ! থালা বাটি টাকা থেকে সোনাদানা হিরে-জহরত পর্যন্ত যে-কোনো জিনিস চুরি গেলেই লোকে থানায় ডায়রি করাতে যায়। চুরি ইজ চুরি। এমন কোনো নিয়ম আছে যে এই এই জিনিসগুলো চুরি গেলে ডায়রি নেওয়া হবে, অন্যগুলো হবে না ! এমন কোনো নিয়ম নেই। হরি ঘোষে থাকতে একবার একজনকে আমি কুকুরের বাচ্চা চুরি যাওয়ার জন্যে ডায়রি করতে যেতে দেখেছি।"

দত্তবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার মাথা দেখেছ। এমন আজগুবি কথা বলো তুমি। পেনু থানায় গিয়ে ডায়রি করাবে— তার লটারির টিকিট চুরি গিয়েছে। মেরে পেনুকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেবে, যাক না পেনু !"

বিজনের হাসি পাচ্ছিল। মজাটা জমেছে ভাল। বাটিচালা, চালভাজা-খাওয়া থেকে থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে, এরপর এরা কী করবে ?

মেজোবাবু বললেন, "থা-থানা এমনি চু-চুরিতেই কিছু ক-করে না তো ল-ল-লটারির টিকিট। চু-চুরি না হা-হারানো তাও ক্লিয়ার নয়।"

অখিলদা বললেন, "হারাবার কেস্ হলে পেনুর দোষ, কারও কিছু করার নেই। চুরির কেস হলে অন্য ব্যাপার।"

"কী বলছ তুমি ?" দত্তবাবু চটে গেলেন, "এতগুলো লোককে তুমি চোর বলছ ?"

"আমি বলিনি, তোমরাই বলছ ! তোমরাই তখন থেকে বলতে শুরু করেছ, কেউ-না-কেউ টিকিটটা হাতিয়েছে।"

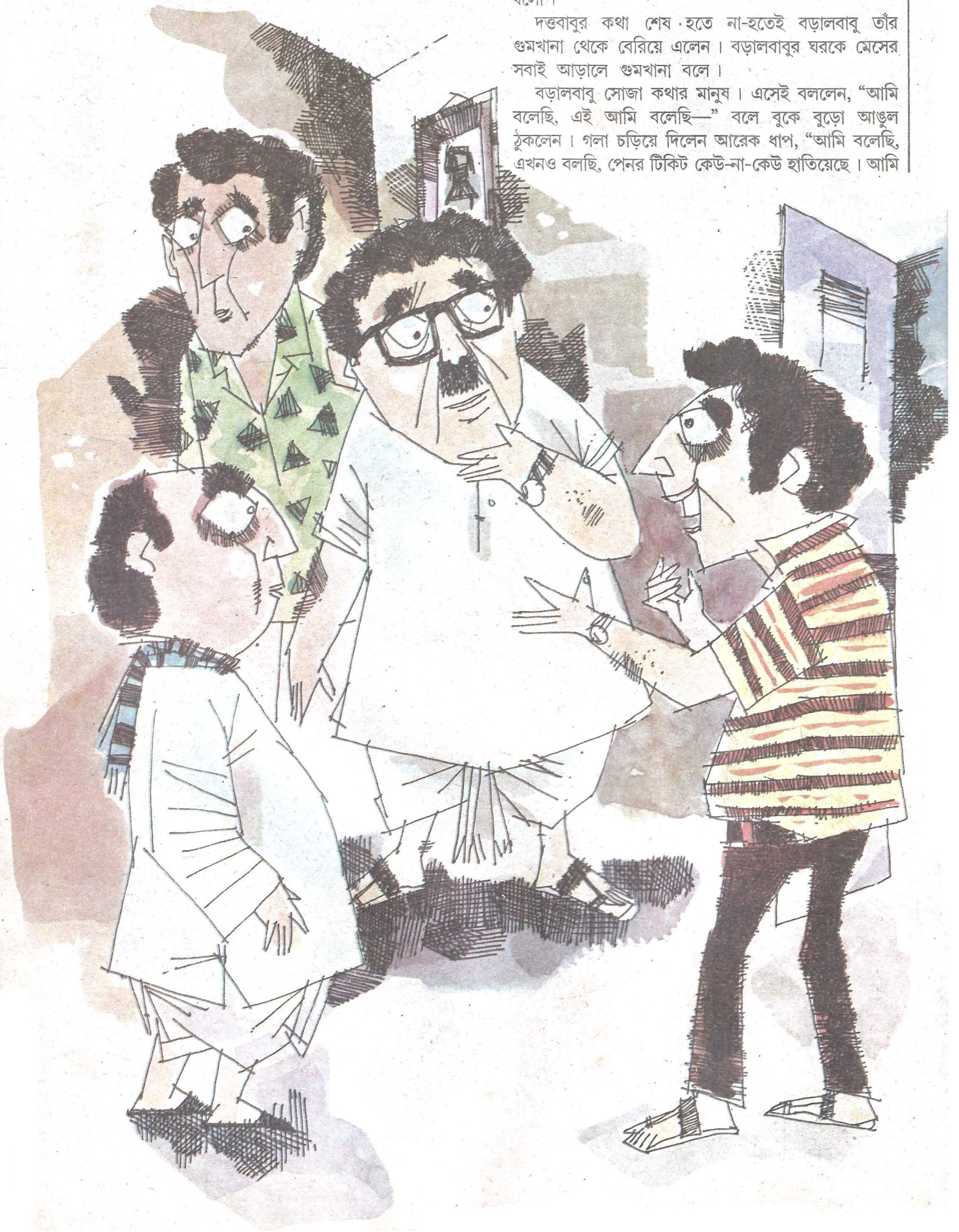

"বাজে বোকো না, কথাটা আমি বলিনি, যে বলেছে তাকে বলো।"

দত্তবাবুর কথা শেষ হতে না-হতেই বড়ালবাবু তাঁর গুমখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। বড়ালবাবুর ঘরকে মেসের সবাই আড়ালে গুমখানা বলে।

বড়ালবাবু সোজা কথার মানুষ। এসেই বললেন, "আমি বলেছি, এই আমি বলেছি—" বলে বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন। গলা চড়িয়ে দিলেন আরেক ধাপ, "আমি বলেছি, এখনও বলছি, পেনর টিকিট কেউ-না-কেউ হাতিয়েছে। আমি

কারুর নাম বলিনি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, হোক। সত্যি কথা বলতে শিবু বড়ালের মুখে আটকায় না। বড়াল তোমাদের ডোন্ট কেয়ার করে। আমি বলব আমার যা মনে হয়। এতে যার ইচ্ছে হয় মেসে থাকুক, যার মানে লাগবে মেস ছেড়ে দিতে পারে। আমি কচুর কেয়ার করি না।"

পাশেই খাবারঘর। পাত পেড়ে খাওয়ার বদলে এখন লম্বা সরু টেবিল আর বেঞ্চিতে বসে খেতে হয়। দু-চার জন নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে উঠে পড়ছিল। তাদের মধ্যে আনন্দ ছিল অতি ফাজিল ছেলে। এঁটো হাতে বেরিয়ে এসে বলল, "বড়ালদা, চালে ভুল হচ্ছে আপনার। মেস ছেড়ে দিলে আর আপনি চোর ধরবেন কেমন করে! মেস কেউ ছাড়তে পারবে না, সবাইকার তল্লাসি হবে, ঘরদোর, বাক্স-প্যাঁটরা, মায় পরনের জামাকাপড়। প্রথমে সার্চ, তারপর কথা—তাই না!" বলে আনন্দ মুখ ধুতে কলতলায় চলে গেল।

ততক্ষণে মানিকদা বেরিয়ে এসেছেন বড়ালবাবুর ঘর থেকে। বললেন, "আঃ শিবু, মাথা গরম কোরো না। ঘরে এসো। আমি একটা মতলব বার করেছি।"

বড়ালবাবু আবার তাঁর গুমখানায় ঢুকে গেলেন।

॥ দুই ॥

অফিসে গিয়ে বিজন শুনল, মধ্যমগ্রাম যাওয়া হচ্ছে না। পরিতোষ খবর দিয়ে গিয়েছে বাড়িতে একটা ঝঞ্ঝাট বেধেছে, সে যেতে পারছে না। আসছে শনিবার যাবে।

বিজন মুষড়ে পড়ল। সবে গরম পড়ছে। চৈত্র মাসের শুরু। ভেবেছিল কলকাতার বাইরে গিয়ে একটা দিন আমেজ করে আসা যাবে, তা আর হল না।

বিকেলের দিকে বন্ধু মুকুলের সঙ্গে চা খেতে খেতে বিজন বলল, "পরিতোষ ডুবিয়ে দিল। কোথায় ভাবলাম আমজামের ছায়ায় বসে ঘুঘুর ডাক শুনব আর মাছ ধরব—দিল সব ভেস্তে।"

মুকুল বলল, "ঘুঘুর ডাক শুনতে মধ্যমগ্রাম যেতে হবে না, কলকাতায় কি কম ঘুঘু?"

বিজন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, তারপর বুঝল। বুঝে হেসে উঠল।

"তোকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।" বিজন বলল।

"কী খবর?"

"আমাদের মেসের পেনুঠাকুর লটারিতে দেড় লাখ টাকা পেয়েছে।"

"অ্যাঁ! ...দেড় লাখ! বলিস কী!" মুকুল অবাক হয়ে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। "কোন্ লটারি? ওয়েস্ট বেঙ্গল?"

"না।"

"ওয়েস্ট বেঙ্গলেই টাকা কম, আর সব জায়গায় তিন পাঁচ সাত—লাখ লাখ টাকা।"

"এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়। কিসের একটা চ্যারিটির।"

মুকুল হঠাৎ বলল, মজার গলায়, "লটারিতে টাকা পাওয়া লোক আমি একটাও দেখিনি। শুনেই আসছি, এ পেয়েছে ও পেয়েছে। এই প্রথম চেনাশোনা একটা লোককে দেখব যে লটারিতে টাকা পেয়েছে। চল, আজ তোর মেসে গিয়ে পেনুঠাকুরকে দেখে আসি।"

"দেখতে যেতে পারিস, তবে মন খারাপ হয়ে যাবে।"

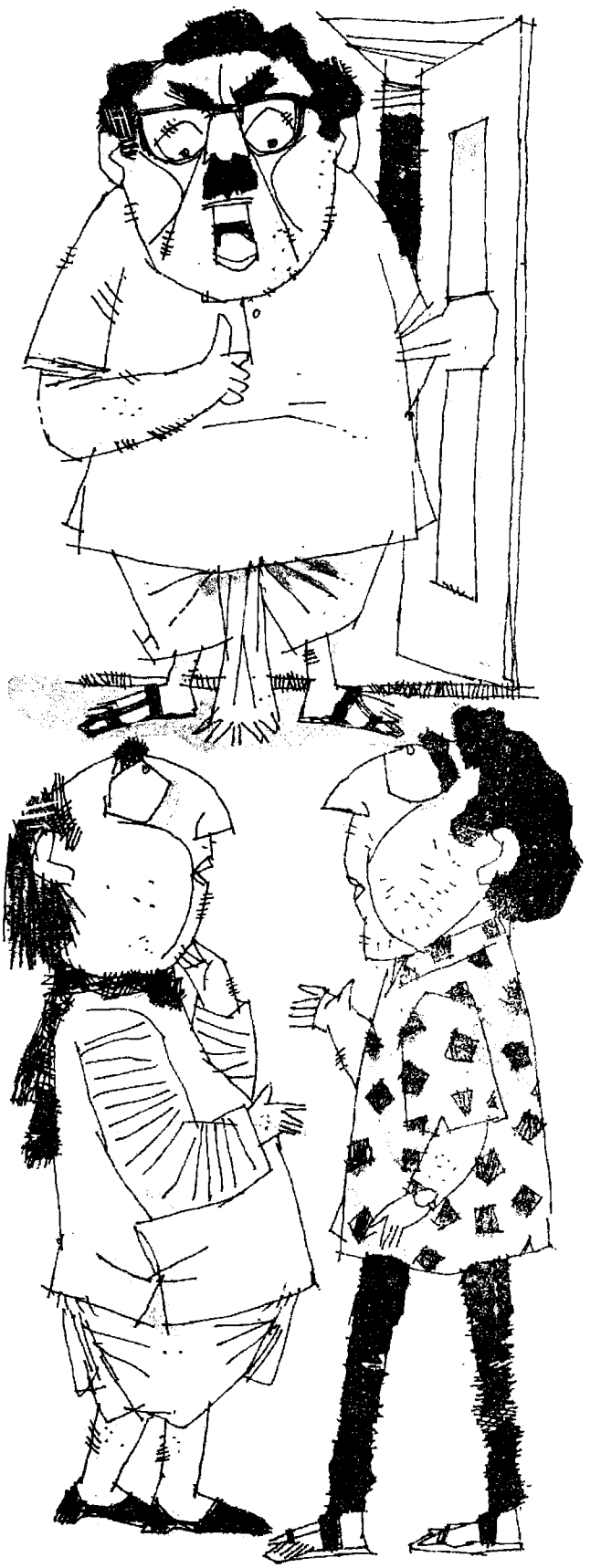

বিজন যেন রহস্য করেই বলল।

"কেন ? হিংসে হবে বলছিস ! না রে ভাই, নো জেলাসি। লটারিতে যে টাকা পায় তার সাত জন্মের পুণ্য থাকে, আমার এক জন্মেরও নেই। চল্, একবার পেনুঠাকুরের গা ছুঁয়ে আসি।" মুকুল হাসতে লাগল।

বিজন বলল, "গা ছুঁয়ে লাভ হবে না। পেনু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে রে ! তার দেড় লাখ টাকা সেরেফ পকেটমার হয়ে গেছে ! ধর, জলেই পড়ে গেছে।"

"মানে ?"

"পেনুর টিকিটটাই হারিয়ে গিয়েছে। লস্ট।"

"হারিয়ে গিয়েছে ! এই যে বললি প্রাইজ পেয়েছে।"

বিজন এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "পেয়েছিল। গত কাল পেয়েছিল। সন্ধে কি রাত পর্যন্ত পেনু দেড় লাখ টাকার মালিক ছিল কাগজে-কলমে। আজ সকালবেলায় তার সব টাকা গঙ্গায় পড়ে গিয়েছে। মানে, পেনুর টিকিটটা হারিয়ে গিয়েছে।"

মুকুল কেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না ক' মুহূর্ত। পরে বলল, "টিকিট হারিয়ে গেছে ! বলিস কী রে।"

"হ্যাঁ। আবার কেউ কেউ বলছে, চুরি। টিকিটটা কেউ চুরি করেছে।"

"চুরি ?"

"বলছে তো তাই।"

মুকুল ভাবল সামান্য, বলল, "হতে পারে। যে টিকিটে টাকা উঠেছে, সেই টিকিটটা যদি কেউ হাতে পায় ছেড়ে দেবে ! চুরিও হতে পারে। কিন্তু তোদের মেসে এমন কে আছে যে পেনুঠাকুরের টিকিট চুরি করবে !"

"কী জানি ! আমি তো ভেবেই পাই না।"

"তবু ভেবে দেখ্ না একটু ! কাকে তোর সন্দেহ হয় ?"

বিজন মুকুলের চোখে চোখে তাকাল। "সকলকে।"

"সকলকে ?"

"হ্যাঁ। টাকার লোভে যদি চুরি করতে হয়—সকলেই করতে পারে।"

"ও তো কথার কথা," মুকুল বলল, "সবাই তো আর চোর নয়। কেউ একজন করেছে। কে কে করতে পারে সন্দেহ হলে তবে না চোর ধরার চেষ্টা হতে পারে।"

বিজন হাসল। বলল, "দেখ ভাই, যদি প্রয়োজনের কথা ধরিস—আমরা যারা বড়ালবাবুর মেসে থাকি, আমাদের কাছে দেড় লাখ টাকা স্বপ্ন। লোভ সকলেরই আছে। তবে মনে মনে লোভ থাকা আর দেড় লাখ টাকা হাতাবার চেষ্টা এক নয়। এখন যদি তুই বলিস—টাকা হাতাবার মতন ধুরন্ধর কে কে আছে, তা হলে অবশ্য ভাবতে হবে।"

"তাই ভাব।"

"ভেবে লাভ ! আমি কি গোয়েন্দা ? না আমায় কেউ গোয়েন্দাগিরি কাজটা দিচ্ছে ? তা ছাড়া চুরির ব্যাপারটা ফালতু হতে পারে। পেনু হয়তো টিকিটটা হারিয়েছে। অনর্থক চোর খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করব কেন ?"

॥ তিন ॥

মেসে ফিরতে ফিরতে বিজনের রাত হল সামান্য। মুকুলের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল, সিনেমা-ফেরত মেসে। ঘরে পা দিতে না-দিতেই শুনল, আজ বিকেলের দিকে জবরদস্ত ঝগড়া গলাবাজি হয়ে গিয়েছে। সেই ঝগড়ার জের বড় জোর ঘণ্টাখানেক হল থেমেছে।

ব্যাপার কী ?

হরিদা বললেন, তিনি ফিরেছেন সন্ধের মুখে, সবিস্তারে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তিনি এসে যা শুনেছেন যা দেখেছেন বলতে পারেন। ঝগড়ার শুরু অনাদি চাটুজ্যেকে নিয়ে। অনাদি প্রতি শনিবার বাড়ি যায়, ফেরে সোমবার অফিস-ফেরত। অনাদির বাড়ি ছোটজাগুলিয়া। বাড়ি যাবে বলে অনাদি তৈরি হচ্ছিল। টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে সে—হঠাৎ বড়ালবাবুর হুকুম হল, মেস ছেড়ে বাড়ি যাওয়া চলবে না।

তার মানে ? যাওয়া চলবে না মানে ?

মানে, কাল সকালে তালতলা থেকে নবীন সাঁই আসছে। নবীন সাঁই হারানো জিনিস, চুরি যাওয়া জিনিসের হদিস বলে দিতে পারে। আরও অনেক কিছু পারে। লোকটা গুপ্তবিদ্যা জানে। তবে নেশাভাঙ করে করে নিজের গুণ নষ্ট করছে।

অনাদি চটে লাল হয়ে গেল বড়ালবাবুর ওপর। সে সামান্য চাকরি করে, গরিব, দেশে চার-পাঁচজন পুষ্যি বলে বড়ালবাবু তাকে চোর বলে সন্দেহ করবে ? এই অবস্থায় সকলেরই আত্মসম্মানে লাগার কথা, অনাদিরও লাগল। ঝগড়া শুরু হয়ে গেল বড়ালবাবু আর অনাদিতে।

সেই ঝগড়াই গড়াতে লাগল, অফিস-ফেরতা নিবারণদা ও আরও কেউ কেউ এসে পড়ায় ঝগড়া জমে গেল। শেষ পর্যন্ত দুটো দল হয়ে গেল বাবুদের মধ্যে। বড়ালবাবু, মানিক মিত্তির, যতীনবাবু—এরা একটা দল, জনা-চারেক হবে বড়ালবাবুর দলে। বাকি ছ'জন অনাদির দলে। জনা-দুয়েক তখনও ফেরেনি, অন্য দুজন অফিস থেকেই বাড়ি চলে গিয়েছে—বড়ালবাবু তাদের আটকাবার সুযোগই পাননি।

ঝগড়ার শেষ কখনও হয় নাকি ? তখনকার মতন চাপা পড়েছিল। বড়ালবাবুর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাচ্ছিল, মাথা আর মুখ কোনোটাই ঠিক ছিল না বলে ঝগড়াটা তখনকার মতন থেমে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল দুই পক্ষ।

হরিদা বললেন, "বড়ালবাবুরা মেসটা তৈরি করেছিলেন বলে তার মালিক হয়ে গেছেন—এমন ব্যবহার করেন। জিনিসটা ভাল না। তুমি যদি মালিকানা করবে—এটাকে হোটেল করে ফেলো, বিজনেস লাইসেন্স নাও, খাতাপত্তর করো, অফিস করো। কিছুই করব না, বসে বসে মালিকানা করব, তাই কি হয় নাকি ?"

বিজন বলল, "ঠিকই বলেছেন। তবে বড়ালবাবুর তো আর কিছু করার নেই, খোঁড়া মানুষ, একা লোক, খবরদারি করার নেশা ছাড়তে পারেন না।"

হরিদা বললেন, "এবার ছাড়তে হবে হে। দিনকাল পালটে যাচ্ছে, বুঝছ না। মাতব্বরি আর সহ্য করবে না কেউ।"

বিজন কিছু বলল না।

গা-হাত ধুয়ে বিজন গেল ছাদে একটু পায়চারি করতে। ছোট ছাদ। আলসের অর্ধেকই ভাঙাচোরা। প্রচণ্ড গরম পড়লে মেসের অনেকেই রাত্রে ছাদে মাদুর বিছিয়ে শোয়। সন্ধের দিকেও পায়চারি, গল্পগুজব করে অনেকেই।

ছাদে এখন কেউ ছিল না। বিজন অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল। আকাশভরা তারা। আজ কী তিথি কে জানে। মাঝে-মাঝে ফুরফুর হাওয়া দিচ্ছিল। চার দিকের বাড়িগুলো এমন গায়ে-গায়ে বাঁকাচোরা ছাঁদে দাঁড়িয়ে আছে যে, ভাল করে হাওয়াও আসে না। বিজনের শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল, মোটামুটি ঠাণ্ডা রয়েছে ছাদে, আরাম লাগছিল।

নোংরা ছাদ। ধুলোময়লায় ভর্তি। বিজনের শোয়া হল না। নীচে নেমে গিয়ে মাদুর শতরঞ্জি আনতেও তার উৎসাহ নেই, অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল।

আর হঠাৎ তার মনে হল, পেনুর টিকিট হারানো নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করলে কেমন হয়। মুকুল যা বলছিল, সময় কাটবে, ঘিলু সাফ হবে, চাই কি উত্তেজনাও হতে পারে—তেমন তো হতেই পারে।

বিজনের নিজেরই হাসি পেল। আবার ভাবল, হাসির কিছু নেই। দেড় লাখ টাকা চুরি সোজা কথা নয়। এখন না-হয় টাকার দাম গোয়ালার দুধের মতন হয়ে গেছে—বিশ-পঁচিশ বছর আগে হলে কী হত ?

বিজন গোয়েন্দা-বই অজস্র পড়েছে। হাতে এলে এখনও পড়ে। একজন গোয়েন্দার মগজ এমন কিছু নয়। বইয়ের গোয়েন্দারা লেখকের বরপুত্র যেন, লেখকরাই তাদের বাঁচায়। লেখকের জন্যেই তারা সব গোয়েন্দা, নয়তো বুদ্ধির খেলা এমন কী রয়েছে তাদের।

বিজন একবার গোয়েন্দা হয়ে দেখতে পারে—ব্যাপারটা কেমন ?

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এ-বাড়ির ছাদের সিঁড়ি কাঠের। খোলা সিঁড়ি। সেকেলে বাড়িতে আকছার যেমন দেখা যায় এদিকে।

পায়ের শব্দ হচ্ছিল।

একটু পরেই আনন্দকে দেখা গেল। বিজনেরই সমবয়েসি। চাকরি করে পোর্টে। পাওয়ার লিগে ফুটবল খেলে। সব ব্যাপারে তুখোড়। ঠোঁটকাটা। দেখতেও ভাল। বিজনকে 'বিজনদা' বলে, বয়েসের জন্যে নয়, আদর করেই।

আনন্দ বলল, "হরিদা বললেন, তুমি ছাদে। হাওয়া খাচ্ছ ?"

বিজন মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে। মজার ভাবটা প্রকাশ করল না। বলল, "চিন্তা করছিলাম।"

"চিন্তা, কিসের ?"

"বল্ তো কিসের চিন্তা ?"

"জানি না। তোমার আবার চিন্তা।...তুমি মেসের কেচ্ছার কথা শুনেছ ? এখানে আর থাকা যায় না। ভদ্দরলোকের মেস, না ছোটলোকের ?"

বিজন বলল, "সব শুনেছি। নিজের চোখেও তো কিছু কিছু দেখছি। আমি ঠিক এই ব্যাপারটাই ভাবছিলাম আনন্দ। ভাবছিলাম, একবার গোয়েন্দাগিরি করলে কেমন হয় ?"

"গোয়েন্দাগিরি ? মানে ?"

"মানে—পেনুর লটারির টিকিট নিয়ে গোয়েন্দাগিরি।"

আনন্দ যেন বিরক্ত হল। "তোমার সব ব্যাপারে তামাশা !"

"না রে ! তামাশা নয়। সিরিয়াসলি বলছি।" বলে বিজন আনন্দকে টেনে নিয়ে চলে গেল ছাদের পশ্চিম কোণে। গঙ্গাজলের ট্যাংকের কাছে। নামেই ট্যাংক। কবেকার একটা ট্যাংক, ফুটোফাটা হয়ে পড়ে আছে। আজকাল আর জলও ওঠে না।

ট্যাংকের পাশে সিমেন্টের উঁচুমতন জায়গা খানিকটা, কোনোরকমে বসা যায়। বিজন আনন্দকে টেনে নিয়ে ভাগাভাগি করে বসল।। বলল, "আমাদের ইনভেস্টিগেশানের কোড নাম হবে অপারেশন পি।" বলে বিজন হোহো করে হেসে উঠল।

আনন্দও হেসে ফেলল।

হাসি থামলে বিজন বলল, "এবার কাজ শুরু করা যাক। ফাজলামি নয়।...আচ্ছা, প্রথম কথা হল, আমাদের গোড়ায় গলদ করলে চলবে না। প্রথমেই দেখতে হবে, পেনু টিকিট হারিয়ে ফেলেছে কিনা ! যদি হারিয়ে ফেলে থাকে—তবে কারও কোথাও দোষ নেই।"

"কেমন করে বুঝব হারিয়েছে কিনা ?"

"পেনুকে খুঁচিয়ে জানতে হবে।"

"পেনু তো এখনও থেকে থেকে ভিরমি খাচ্ছে।"

"যাক্। টিকিট খুঁজে দেব শুনলে জ্যান্ত হয়ে বসে পড়বে। দেড় লাখ টাকা।"

"তা ঠিক।" আমরা ধরে নিচ্ছি, অনুমানে, হারায়নি। টিকিটটা চুরি গেছে।"

"ধরলাম।"

"তা হলে কে চুরি করল ?"

"কেনই বা করবে ?"

"ঠিক। যে চুরি করেছে—সে টাকার লোভে করেছে। এই

সব লটারির টিকিটে কোনো নাম থাকে না। কেনার সময়ও কেউ নাম লিখিয়ে নেয় না। নম্বরই আসল। তোর জিনিস আমি যদি হাতিয়ে নি—টাকাটা আমিই পাব।"

"তা পাও। আমার কপালে লটারি নেই। দু-চার বার ওয়েস্ট বেঙ্গল কেটেছি। দশ মাইল তফাত দিয়ে প্রাইজগুলো বেরিয়ে গিয়েছে।" আনন্দ হাসল।

বিজন বলল, "চুরি যদি হয়ে থাকে, মেসের কেউ করেছে।"

"কেন ? বাইরের লোক করতে পারে না ? পেনু বাইরের কাউকে টিকিট দেখায়নি ? পেনুর কাছে বাইরের লোক পান-গুণ্ডি খেতে আসে না ? গল্প করতে আসে না ? পেনুর ঘরে যে দুপুরবেলা টুয়েন্টি নাইন তাস চলে, সেই তাসের দলও তো টিকিট চুরি করতে পারে।"

"পারেই তো। সেটাও বিবেচনা করতে হবে। ... তবু ধরে নেওয়া যাক মেসের কেউ চুরি করেছে। টাকার লোভেই করেছে। এবার কথা হল, আমরা কাকে কাকে বেশি সন্দেহ করব, কাকে কম, কাকে একেবারেই করব না।"

"তুমিও তা হলে সন্দেহের মধ্যে পড়ছ ?"

"তুই আমি—সবাই। একমাত্র বাদ যাচ্ছেন দাশদা, কেননা দাশদা গত পাঁচ দিন থেকে মেসে নেই। ও. কে.?"

মাথা নাড়ল আনন্দ।

বিজন বলল, "এবার আমাদের মেসের ডিটেলটা একটু দেখা যাক। বাড়িটা আড়াইতলা। আড়াইতলাও নয়—পৌনে-দু'তলা। বাসিন্দে জনা-পনেরো।"

"নাম বলব বাসিন্দেদের ?"

"বল্।"

"বড়াল দি গ্রেট, মেজোবাবু, দত্তবাবু, হরিদা, চাটুজ্যেদা, অখিলদা, দাশদা, নিবারণদা, জ্যোৎস্নাবাবু, গানের মাস্টার, তুমি, আমি, করালীবাবু আর যতীনবাবু। সব নামই বললাম তো ?"

"বলেছিস বোধহয়। ...এর মধ্যে মানিকদা নেই, তাঁকেও ধরতে হবে। তাঁর দশ আনা এখানে; ছ আনা বাড়িতে।"

"লোকটাও জাঁহাবাজ।"

"মানিকদার মতন জাঁহাবাজ, ধূর্ত, চারদিকে নজর রাখে, লোভী আর কে কে আছে ?"

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না। ভাবছিল। শেষে বলল, "জ্যোৎস্নাবাবু লোকটাও সুবিধের নয়। শুনেছি ওর বিস্তর ধারদেনা, জুয়াটুয়াও খেলে, মারদাঙ্গা টাইপের।"

"গানের মাস্টারকেও তুই সাসপেক্ট হিসেবে ধরতে পারিস। আমি ওকে রিজেন্ট সিনেমার কাছে রেস্টুরেন্টে ফেকলু সিনেমা পার্টির ছোঁড়াদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতে দেখেছি। কিসের একটা সিনেমা করবে বলে বোলচাল দিচ্ছিল। গানের মাস্টার ধারে ডুবে আছে। বড়ালবাবু প্রায়ই বলেন, ওকে আর মেসে রাখা যাবে না। মেসের প্রত্যেকের কাছে ওর বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা ধার।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "অথচ বড়ালবাবু গানের মাস্টারকে তাড়ায় না।"

"কাল আবার মাথা ফাটিয়ে বসল মাস্টার।"

"শুনলাম। লেগেছে জোর ?"

"না, মারাত্মক কিছু নয় ? ...মাঝরাত্তিরে বাতি না জ্বেলে কেউ ওই কলতলা দিয়ে বাথরুমে যায় ? বুদ্ধিখানা কী !"

বিজনের হঠাৎ যেন মাথায় কী এসে গেল। হাত তুলে বলল, "দাঁড়া দাঁড়া, এটা তো ভেবে দেখিনি। ...হ্যাঁ, হতে পারে, হতে পারে। গানের মাস্টাররা থাকে নীচের তলায়। গানের মাস্টার, বড়ালবাবু, দাশদা, মেজোবাবুর দল। আমাদের পেনু আর গিরিধারীর ঘরও কাছাকাছি। গানের মাস্টার অন্ধকারে বাথরুমে যেতে গিয়ে কলতলায় পা পিছলে পড়েছে, না, দু নম্বর চোর তাকে অন্ধকারে দেখতে পেয়ে মাথায় মেরেছে ?"

আনন্দ বোকার মতন বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। গল্পের গোরু গাছে ওঠে, গোয়েন্দাদের মাথা যেমন সাফ তাতে গোরুকে পাহাড়েও চড়িয়ে দিতে পারে। আনন্দ বলল, "তুমি আবার দু নম্বরও পেয়ে গেলে !"

বিজন বলল, "আমি যদি গোয়েন্দা হই, চারজনকে অন্তত সাসপেক্ট করব। মানিকদা এক নম্বর, দু নম্বর গানের মাস্টার, তিন নম্বর জ্যোৎস্নাবাবু, চার নম্বর পেনুর মনিব বড়ালবাবু।"

আনন্দ আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ বিজনদা, তুমি বড়ালবাবুর নামও মুখে এনো না, মেস থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে।"

"অত সস্তা ! দিক না বার করে ! কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ি করে বড়ালচাঁদকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধাপায় জমা করে দেব।"

আনন্দ জোরে হেসে উঠল। বিজনের মতন নিরীহ, সাদামাটা, শান্ত লোক যখন বিক্রম দেখাবার কথা বলে তখন না হেসে পারা যায় না।

বিজন নিজেও হাসছিল।

হাসাহাসি শেষ হলে বিজন বলল, "তুই একটা সোজা কথা বল তো ! ওই বড়ালবাবু আর তার শাকরেদ মানিকদা—দুজনে মিলে গুমখানায় বসে কিসের ফন্দি আঁটছে সারাদিন ? আমি দুটোকেই ঘোরতর সন্দেহ করি।"

আনন্দ বলল, "ওঁরাই আবার মাতব্বরি বেশি করছেন।"

"তা তো করবেনই। পেনুর গার্জেন যে।"

"তা হলে নবীন সাঁই ? বড়ালবাবু যে নবীন সাঁইকে আনছেন কাল ?"

"বোগাস। নবীন সাঁই কী করবে ! সে বেটা বড়ালবাবুদের পয়সা-খাওয়া লোকও হতে পারে। পুরো ব্যাপারটা অন্য দিকে চালিয়ে দেবে। ওটা ধাপ্পাও হতে পারে। ... যাকগে, আমাদের কাজ আজ থেকেই শুরু করা যাক। তুই পেনুকে ধর। ডিটেল জেনে নে। আমি অন্যদের ওপর চোখ রাখছি।"

॥ চার ॥

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল, তালতলার নবীন সাঁই এল না। মেসের মধ্যে একটা চাপা গুমোট অবস্থা চলেছে। বড়ালবাবুর ওপর রাগে গজরাচ্ছিল অনেকেই। বড়ালবাবুর হুকুম ছিল, নবীন না আসা পর্যন্ত কেউ যেন মেসবাড়ি ছেড়ে না যায়। অবশ্য এমনিতে মেসবাড়ির বাসিন্দেরা রবিবারের সকালটা যে যার নিজের কাজকর্মের জন্যে রাখে। সারা সপ্তাহের জমানো কাজ—চুলকাটা, জুতো সাফ থেকে জামাকাপড় চাদর গেঞ্জি কাচা পর্যন্ত—যার যা জমে আছে সেরে ফেলে। তবে নিজের মর্জিতে মেসে থাকা আর হুকুম মেনে মেসে বসে থাকার মধ্যে অনেক তফাত।

বড়ালবাবুর হুকুম মানতে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত অকারণ অশান্তি বাড়াল না কেউ। মনে মনে খেপে থাকল। বড়ালবাবুকে দেখে নেব-গোছের এক ভাব নিয়ে সকালটা কাটিয়ে দিল।

আনন্দ আর বিজন নিজেদের মতন করে গোয়েন্দাগিরি শুরু করল। ওদের ভাবভঙ্গি থেকে বোঝার উপায় ছিল না—কোনো মতলব এঁটে নেমেছে দুজনে।

বিকেলের দিকে দুজনে গেল গলিতে চায়ের দোকানে চা খেতে। কথাবার্তা সেখানেই হবে।

দোকানে বসে আনন্দ বলল, "বিজুদা, পেনুর টিকিট নিয়েই তো গোলমাল আছে।"

বিজন অবাক হয়ে বলল, "সে কী ! জাল টিকিট নাকি ?".

"সাচ্চা ঝুটা জানি না। ব্যাপারটা বলি তোমায়—শোনো।"

আনন্দ যা বলল তার থেকে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়। পেনু হল ঝাড়গ্রামের লোক। বাড়ি কাছে বলে প্রায়ই তার আত্মীয়স্বজনরা পেনুর কাছে আসে এক-আধবেলা থাকতে, খোঁজখবর নিতে। পেনুর নিজের কোনো সংসার নেই, বিয়ে-থা করেনি। তার গ্রামতুতো ভাইপো-ভাগ্নের সংখ্যাই বেশি, নিজেরও দু-চারজন আছে। এক ভাগ্নে এসেছিল ক'দিন আগে। সে কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা টিকিট কিনে এনে দিয়েছিল পেনুকে। কেন দিয়েছিল তাও পেনু জানে না। ভাগ্নে বলেছিল, দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তমলুকের লোক, গপ্পটপ্প হচ্ছিল—তা একটা টিকিট কেটে নিলুম। তুমি রেখে দাও, মামা।

এই দোকানটা পেনু জানে না, চোখেও দেখেনি। কলেজ স্ট্রিটের তামাম এলাকায় লটারির দোকান কি কম !... তা টিকিটের কথাও পেনু ভুলে গিয়েছিল। কথাটা জানত গিরিধারী, পেনুর অ্যাসিসটেন্ট। মানে মেসবাড়ির রান্না, মসলাবাটা, খেতে দেবার সময় থালা গ্লাস এগিয়ে দেওয়ায় পেনুর ডানহাত। গিরিধারী মেজোবাবুদের ঘরে গিয়েছিল চা দিতে সকালবেলায়, টাটকা খবরের কাগজ হাতে করে মেজোবাবুরা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কী কথায় যেন লটারির টিকিটের কথা বলছিলেন। গিরিধারীর মনে পড়ে গেল, পেনুর কাছে একটা টিকিট আছে। সে অতশত বোঝে না। এসে পেনুকে বলল।

পেনু তার টিকিট নিয়ে গেল বড়ালবাবুর কাছে। এই মেসে তিনটে বাংলা কাগজ আসে। একটা কাগজ কেনেন বড়ালবাবু, একটা কেনেন মেজোবাবু আর অন্য কাগজটা যায় হরিবাবুর কাছে। তিনটে বাংলা হলেও তিন নামের কাগজ। অন্য বাসিন্দেরা কাগজ কেনে না, চেয়েচিন্তে দেখে নেয়।

বড়ালবাবু পেনুর টিকিট মেলাবার পর নিজে থেকে কিছু বলেননি, চুপ করে ছিলেন। বড়ালবাবুর সামনে ছিল অনাদি, সে হঠাৎ টিকিটটা টেনে নিয়ে কাগজ দেখে মিলিয়ে নিল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'পেনু, এ যে তোমার টিকিটের নম্বর। ফার্স্ট প্রাইজ !'

বড়ালবাবু ভীষণ চটে গিয়েছিলেন অনাদির চেঁচামেচিতে। এইভাবে চেঁচিয়ে টাকার ব্যাপার বলতে হয় !

তা পেনুর লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার খবরটা তারপরই মেসের মধ্যে রটতে থাকে। মুখে মুখে সেটা বাইরেও সামান্য রটেছিল কিনা কে জানে।

বিজন মন দিয়ে সব শুনছিল। চা খেতে খেতে বলল, "বড়ালবাবুর এত সাবধান হবার কারণ অতগুলো টাকা একজন মেসের বামুনঠাকুর পেয়েছে—এটা চট করে রটিয়ে দিতে চাননি ?"

"উলটোটাও হতে পারে," আনন্দ বলল, "পেনুঠাকুর লেখাপড়া জানে না। তার টিকিটে টাকা উঠেছে—এটা যদি তাকে না জানিয়ে সরিয়ে ফেলা যায়, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকাটা নিজে হজম করা চলে।"

"তাতে খানিকটা রিস্ক আছে।... পেনু যদি টিকিটটা ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দেখায়।"

"তাই কি কেউ দেখায় ! একবার দেখলাম—নম্বর মেলালাম, হল না—ফুরিয়ে গেল। সেই টিকিট নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। আরে আমরাও তো এক-আধবার কেটেছি। যেই দেখেছি ফক্কা, টিকিটটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পেনু, যে বেচারি টিকিটের 'ট' বোঝে না, তার কাছে একটুকরো ছাপা কাগজের কী দাম !" বলে আনন্দ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

বিজন বলল, "তার মানে তুই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চাইছিস বড়ালবাবুর তাল ছিল পেনুকে মিথ্যে কথা বলে টিকিটটা হাতানো ?"

আনন্দ মাথা হেলিয়ে বলল, "হতে পারে।"

বিজন আনন্দের দেওয়া সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া টানল জোরে জোরে, বলল, "ব্যাপারটা তা হলে এইভাবে দাঁড় করানো যাক।"

বাধা দিল আনন্দ। বলল, "তুমি কি জানো, মানিকদা পেনুকে বলেছিলেন, টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে—তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন !"

"পেনু বলল ?"

"হ্যাঁ, পেনু বলল, মানিকবাবু তাকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে বলেছিলেন। পেনু রাজি হয়নি।"

"ও !...এখন তা হলে দুই বন্ধু—বড়ালবাবু আর মানিকদা গুমখানায় বসে কিসের পরামর্শ করছেন ?"

"কী জানি !"

বিজন সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, "এবার তা হলে একটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স করে এগুনো যাক আনন্দ। পয়েন্টগুলো হল, আমরা বড়ালবাবু আর মানিকদা দুজনকেই সন্দেহ করছি। বড়ালবাবুকে করছি—কারণ—বড়ালবাবু পেনুর টাকা পাবার খবর পেনুকে বলতে চাননি প্রথমে। আর মানিকদাকে করছি—কারণ, তিনি চুপিচুপি আড়ালে পেনুকে বলেছিলেন টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে। তবে এই সন্দেহ নিছকই সন্দেহ, ধোপে টিকবে কি না বলা মুশকিল।"

"কেন ?"

"বড়ালবাবুর কথা ধর। বড়ালবাবু বলবেন, পেনুর মতন মানুষকে ঝপ করে দেড় লাখ টাকার খবর দিলে মানুষটার মাথার গোলমাল হয়ে যেতে পারে বলে ঝট করে খবরটা দিতে চাননি। রইয়ে-সইয়ে দিতেন। তা ছাড়া, খবরটা বেশি জানাজানি হয়ে গেলে টিকিট চুরির ভয় ছিল—যা শেষ পর্যন্ত

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা.৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

সত্যিই চুরি গেল।"

"পেনুও বলছে, টিকিট্ চুরি গিয়েছে। আমি তাকে নানা কায়দা করে জিজ্ঞেস করেছি। প্রতিবারেই এক কথা। টিকিটটা সে তার ঘরে কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখেছিল।" আনন্দ বলল।

কথাটা কানে তুলল না যেন বিজন, বলল, "মানিকদাকে আমরা সন্দেহ করছি। কিন্তু মানিকদাও বলতে পারেন—বাপু, দেড় লাখ টাকার টিকিট, কোথায় হারিয়ে ফেলবে পেনু—তাই আমার কাছে রাখতে বলেছিলুম। রাখতে বলেছি বলেই আমি চোর!"

আনন্দ বলল, "কেউ যদি চোর নয় তা হলে চোর কে?"

"আমাদের অন্য দুজন সাসপেক্ট ছিল : গানের মাস্টার আর জ্যোৎস্নাবাবু। এর মধ্যে গানের মাস্টার কাল মাঝরাতে মাথা ফাটিয়েছে। বলছে—কলতলায় পড়ে গিয়েছিল। তা সে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, পেনুর ঘরের দিকে যে-চোর পাহারা দিয়ে বসে ছিল সে গানের মাস্টারকে জখম করেছে। গানের মাস্টারের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"না, তেমন কথা কিছু নয়। এই এমনি দু-চারটে কথা। মাস্টারের জখম বেশি নয়। ব্যথা রয়েছে। জ্বর-জ্বর ভাব।"

"ওকে দেখে কী মনে হল?"

"বুঝতে পারিনি।"

"হুঁ! আর আমাদের জ্যোৎস্নাবাবু?"

আনন্দ দু-চারটে টান মারল সিগারেটে। ভাবল কিছু। বলল, "জ্যোৎস্নাবাবু গভীর জলের মাছ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না।"

বিজন চায়ের কাপ অনেক আগেই শেষ করেছিল, আবার দু'কাপ চায়ের হুকুম করল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, "চোর কে তা ধরা না গেলেও একটা ভড়কি দেওয়া যায়।"

"কেমন ভড়কি?"

"বিকেলে আমরা একটা মিটিং ডেকে ফেলি।"

"মিটিং?"

"আরে শোন না, মিটিং মানে কি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জনসভা!... ধর, আজ সন্ধেবেলায় মেসের ছাদে সবাইকে আসতে বলা হল। পেনুর লটারির টিকিট চুরি যাবার ব্যাপারে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে চাই বলে সবাইকে জমায়েত হতে বলছি। মিটিংয়ে আমরা সবাই বলব, আমাদের মেসের ঠাকুর পেনুর লটারিতে টাকা পাবার ঘটনাটা আমরা কাগজে ছাপাতে চাই। সেই সঙ্গে একটা উকিলের নোটিশ। তাতে লেখা থাকবে, পেনুঠাকুরের প্রাইজ পাওয়া টিকিট, কে বা কারা চুরি করেছে। এই টিকিট যদি কেউ লটারিঅলাদের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখায়, টাকার দাবি তোলে—তা হলে যেন পেনু এবং পেনুর উকিলকে না জানিয়ে টাকা দেওয়া না হয়।"

আনন্দ মাথা নেড়ে বলল, "মামার বাড়ি? আমি বললাম, আমার টিকিট চুরি গেছে আর লটারিঅলারা তা মেনে নিল।"

"মানতে কে বলছে! মানবে কি মানবে না—সেটা তাদের ব্যাপার। তুই আমার মতলবটা বুঝতে পারছিস না। আমি বলতে চাইছি, আমরা যদি বলি—কাগজে উকিলের নোটিশ ছাপিয়ে জানাব, পেনুর চুরি-যাওয়া টিকিট জমা দিয়ে টাকা হাতানো বন্ধ করব—তাতে কাজ হবে। চান্স আছে হবার।"

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন সন্ধেবেলায়, সামান্য রাত হয়েছে হয়তো, এক ছোকরা গোছের লোক মেসে এসে হাজির। এসেই বিজনের নাম করে চেঁচাতে লাগল।

বিজন মনে মনে এরই অপেক্ষা করছিল। নীচে নেমে গেল।

"আরে, আপনি দাশুবাবু! আসুন! কী খবর?"

"খবর তো আপনার কাছেই—আসতে বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন!" বলে বিজন বড়ালবাবুর গুমখানার দিকে এগুতে লাগল।

আনন্দ যেন কাছাকাছি কোথাও ওত পেতে ছিল। হাজির হয়ে ন্যাকার মতন বিজনকে বলল, "বিজুদা, পাতিলেবুর শরবত খাবে নাকি?"

"শরবত পরে হবে, আয় এদিকে। এই ভদ্রলোককে নিয়ে বড়ালবাবুর ঘরে যাচ্ছি। আয়। সেই টিকিটের ব্যাপার···।"

আনন্দ বলল, "তাই নাকি! চলো, চলো।"

বড়ালবাবুর ঘরে এসে ঢুকল তিনজনে। বড়ালবাবু আর মানিক মিত্তির কথা বলছিলেন।

বিজন ঘরে ঢুকেই বলল, "বড়ালদা, আরে মানিকদা এখনও আছেন, ভালই হল। বড়ালদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। এঁর নাম দাশুবাবু। ইনি ওই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে একটা ছোট্ট স্টলে বসে টিকিট বেচেন লটারির। অনেক খুঁজে খুঁজে এঁকে পেয়েছি। পেনুর টিকিট এঁর দোকান থেকে কেনা!"

বড়ালবাবু আর মানিক মিত্তির দুজনেই যেন কেমন থ মেরে গিয়েছিলেন। দেখছিলেন দাশুকে।

দাশু বলল, "হ্যাঁ স্যার! আমার দোকানের কপাল খুলে গিয়েছে। কাল যেই না দোকানের সামনে লাল সালু কিনে খবরটা লিখে ঝুলিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে ভিড় লেগে গেল। আজ স্যার পাক্কা একশো চল্লিশ টাকার টিকিট বেচেছি। দোকানের কপালে এত টাকার টিকিট বেচা এই প্রথম।"

"কাল না রবিবার ছিল?" মানিক মিত্তির বললেন।

"লটারির টিকিট বেচার আবার শনি-রবি আছে নাকি?"

"আনন্দ, পেনুকে ডাক—" বিজন আনন্দকে বলল চোখের

ইশারা করে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দাশুকে বলল, "আপনার কাছ থেকে যে টিকিট কেটেছিল তাকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ স্যার! আমরা মুখে অনেককে চিনে রাখি। রেগুলার কাস্টমার থাকে অনেকেই। শিয়ালদা লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার।"

"এ তো রেগুলার কাস্টমার নয়!"

"না। আমার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটি। রোগা-রোগা দেখতে, কালো রঙ, সামনের দাঁত উঁচু। পাজামা ছিল পরনে। ঝাড়গ্রামে বাড়ি।"

"কেন দাঁড়িয়েছিল?"

"ধুলোর ঝড় বাঁচাতে।"

ততক্ষণে পেনু এসে পড়েছে। আনন্দ আরও জুটিয়ে আনছে দু-চারজনকে।

বিজন বলল, "পেনু, তোমার ভাগ্নে এই ভদ্রলোকের দোকান থেকে টিকিট কিনেছিল। অনেক খুঁজে খুঁজে এঁকে বাপু বার করেছি।"

দাশু পকেট থেকে বিড়ি বার করছিল। হেসে বলল, "সালু না টাঙালে বার করতে অসুবিধে হত। অবশ্য আপনি স্যার—আশেপাশের দোকানে খোঁজ করে ভালই করেছিলেন। আমার দোকান থেকে ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে তো—সবাই চিনে গিয়েছে। এমনিতেই চেনাশোনা অনেকেই। তবে এবার জোর টেক্কা দিলাম।"

বড়ালবাবু বললেন, "আপনি কেমন করে জানলেন আপনার দোকানের টিকিট ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে?"

"বা বা, এ আবার কী বলছেন দাদু! আমার দোকানের টিকিট আমি জানব না? টিকিটের টিকিগুলো যে আমার হাতে বাঁধা দাদু। কাগজ দেখলেই জানা যায়, আমার হাত কারও শিকে ছিঁড়ল কি না! তারপর আমাদের প্রাইজ আছে না! এজেন্টের প্রাইজ।"

আনন্দ বলল, "কিন্তু মশাই, আপনি এখন পেনুকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?"

"পারি।"

"পারেন?"

"চেষ্টা করতে পারি। উনি—" বলে দাশু বিজনের দিকে আঙুল দেখাল, "উনি বলছিলেন, টিকিটটা হারিয়ে গিয়েছে। হারানো টিকিটে প্রাইজ হয় না। তবে আমি সাক্ষী হতে পারি, আপনারাও সাক্ষী হবেন। সবাই মিলে উকিলের চিঠি দিয়ে জানাব, টিকিটের আসল মালিক টিকিট হারিয়ে ফেলেছে, নকল মালিককে যেন প্রাইজের টাকা দেওয়া না হয়। পারি কিনা বলুন স্যার আপনারা?"

হরিদা বললেন, "চিঠি নিশ্চয় দেওয়া যেতে পারে, তবে টাকা আটকে রাখা না-রাখার মালিক অথারিটি।"

বিজন বলল, "অল্ রাইট। অথারিটি তাদের নিয়ম মেনে কাজ করুক আপত্তি নেই, আমরাও আমাদের কর্তব্য করব, কী বলেন বড়ালদা! আমরা চেষ্টা করব পেনুর টিকিট হাতিয়ে কেউ যেন মজাসে টাকাটা না পকেটে পোরে!"

আনন্দ মাথা নাড়ল। "আমি কিন্তু একটা কথা বলব?"

"বল্!"

"তোমরা যা করতে চাইছ তাতে আমার একটা অসুবিধে হবে।"

"কেন?

আনন্দ ক' মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তাকাল, দেখল সবাইকে। বলল, "ব্যাপারটা তা হলে বলেই ফেলি। শনিবার দিন অফিসে গিয়ে আমি পেনুর কথা বন্ধুবান্ধব কোলিগদের বলেছিলাম। সবাই পেনুর ব্যাড লাক-এর জন্যে দুঃখ করতে লাগল। কিন্তু আজ প্রলয় সেন বলে আমাদের এক সিনিয়ার কোলিগ আমায় বললেন, তিনি একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন মোটামুটি।"

আনন্দ আর বিজন চোখে চোখে তাকাল। অন্যরা আনন্দর দিকে তাকিয়ে।

আনন্দ বলল, "এই লটারিটা তো একটা ট্রাস্ট থেকে করছে—চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্টের এক কর্মকর্তা হলেন প্রলয়দার মামা, মানে আমার কোলিগ প্রলয় সেনের মামা। প্রলয়দা আমাকে বললেন, তিনি মামার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কাল তাঁর অফিসে। নিজের মুখে গিয়ে বুঝিয়ে সব বলতে হবে তাঁকে। এর মধ্যে তিনি হুকুম করে দিয়েছেন, টাকা কেউ তুলতে পারবে না, মানে ফার্স্ট প্রাইজ!"

বিজন বলল, "আমরাও তো তাই চাই। তা হলে আর···"

"না না," আনন্দ বলল, "তোমরা যদি উকিল-আদালত কর তা হলে মুশকিল হবে—চোর আর ধরা পড়বে না।"

"কেন?"

"সে পিছিয়ে যাবে।···কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি যে-পথে এগুচ্ছিলাম সেই পথে এগুলে চোর হাতেনাতে ধরা পড়ত।"

"কেমন করে?"

"আরে সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছিল। প্রলয়দার মামা চাইছেন, হাতেনাতে চোর ধরা পড়ুক। অফিসে তাঁর হুকুম ছিল, যে-লোকই ফার্স্ট প্রাইজের জন্যে টিকিট দেখাতে আসেন—সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরো।"

"ধরো?"

"হ্যাঁ, ধরে রাখো। খবর দাও প্রলয়দার মামাকে। এরপর যা করার তাঁরাই করবেন। তবে তোমার মেসের অনেকের সাক্ষি লাগবে। পেনুর তো অবশ্যই। চাই কি আমরা দাশুবাবুকেও কাজে লাগাতে পারি।"

বিজন তারিফ করে বলল, "তুই যা করেছিস আনন্দ, ভালই করেছিস। আমরা তা হলে উকিলের কাছে যাব না এখন!"

"দরকার নেই। টাকা হাতানো বন্ধ করাই আসল কাজ। সেটা যখন হয়ে যাচ্ছে···"

হরিবাবু বললেন, "ঠিক, ঠিক কথা। চোর যদি টাকাই না পেল তবে তার চুরি করাই বৃথা হল।"

মানিকবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার হালকা গলায় বললেন, "পেনুর ভাগ্যটাই খারাপ, হাতে পেয়েও দেড় লাখ টাকা হারাল।"

বড়ালবাবু কথা বললেন না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিজন খোলা ছাদে পায়চারি করতে উঠেছিল। রোজই সে এ-সময় খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তার অভ্যেস।

বিজন ছাদে উঠতেই দেখল, গানের মাস্টার। গানের মাস্টার জলের ট্যাংকের সামনে থেকে সরে এল। দেখল

বিজনকে. তারপর তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে যাবার জন্যে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল।

বিজনের মনে হল, গানের মাস্টার যেন রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছে, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সামনে থেকে।

বিজন সিঁড়ি আটকে দাঁড়াল। "কী ব্যাপার ? আপনি ?"

"এমনি," গানের মাস্টার বলল।

"হাওয়া খেতে ?" বিজন ঠাট্টা করে বলল।

"হ্যাঁ। আপনিও তো হাওয়া খেতে আসছেন।"

বিজন বুঝতে পারল, মাস্টার তাকে ঠুকল। মেসের ছাদ, যার খুশি আসতে পারে, পায়চারি করতে পারে।

গানের মাস্টার পাশ কাটিয়ে নেমে গেল।

বিজন দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা। তার সন্দেহ হচ্ছিল। গানের মাস্টার এ-সময় ছাদে উঠে আসবে কেন ? ছাদে পায়চারি করা তার অভ্যেস নয়। কী করছিল ও গঙ্গাজলের পুরনো ট্যাংকের কাছে ?

বিজন কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে গঙ্গাজলের ভাঙাচোরা ট্যাংকের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখতে লাগল চারপাশ। কিছুই নেই। তবে ?

হঠাৎ নজরে পড়ল ট্যাংকের ওপর একপাশে কাগজের ছোট্ট একটা টুকরো। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টুকরোটা। কুচিয়ে একেবারে টুকরো টুকরো করা কাগজের একটা অংশ। বোঝা মুশকিল। অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করা যায় না। পকেট থেকে দেশলাই বার করে বিজন ট্যাংকের আড়ালে বসল। বাতাসে দেশলাইকাঠি নিবে না যায় যেন। কাগজের টুকরোটা দেখল। টিকিটেরই টুকরো।

গানের মাস্টার তাহলে কি টিকিট ছিঁড়তে ছাদে এসে উঠেছিল ? কিন্তু এত জায়গা থাকতে ছাদ কেন ? টিকিট তো যেখানে-সেখানে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া যেত !.

বিজনের মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

পুরনো ভাঙাচোরা জলের ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে বিজন যেন কোনো ধাঁধার জবাব খোঁজবার চেষ্টা করছিল। আরও ঝুঁকে পড়ল ট্যাংকের ওপর। হাত বোলাতে লাগল ধীরে ধীরে। আর হঠাৎ তার আঙুলে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল। কী ? আঙুল টানতেই সুতোর মতন কী একটা উঠে আসতে লাগল। তার পরই বিজন তাজ্জব।

অদ্ভুত ব্যাপার তো ! একটা হাত দেড়-দুই লম্বা টোন সুতোর মাথার দিকটা জলের ট্যাংকের ফাটাফুটির সঙ্গে একজায়গায় বাঁধা ; আর সুতোর তলার দিকে অন্য কী যেন বাঁধা। ট্যাংকের মুখের গর্তের মধ্যে সুতোটা ঝুলছিল।

ছাদে বেশ অন্ধকার। ভাল করে দেখা বা বোঝা যায় না। বিজন সুতোসমেত জিনিসটা টেনে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

হরিবাবু তখনও শুয়ে পড়েননি, শোবার তোড়জোড় করছিলেন।

বিজন হাতের বস্তুটা আলোয় ভাল করে দেখল। একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার। টোন সুতোর যে দিকটা ট্যাংকের মধ্যে ঝুলছিল সেই দিকটায় একটা দেশলাইয়ের খাপ প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে জড়ানো। সুতোয় সেটা বাঁধা ছিল। মানে কেউ সুতোয় দেশলাইয়ের খাপটা বেঁধে ট্যাংকের গর্তের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

"হরিদা ?"

"বলো !"

এই দেখুন। এটা ছাদের ওপর জলের ট্যাংকের মধ্যে ছিল। ঝুলিয়ে রেখেছিল কেউ।"

হরিবাবু দেখলেন। বললেন, "দেশলাইয়ের বাক্সটা তো খালি। অথচ অত যত্ন করে রাখা··· ।"

"আমি বুঝতে পেরে গিয়েছি," বিজন বলল, "ওই দেশলাইয়ের খাপের মধ্যে পেনুর লটারির টিকিটটা কেউ রেখেছিল। পাছে নিজের কাছে কোথাও রাখলে চুরি যায়, বা সার্চ হলে ধরা পড়ে যায়—তাই জলের শুকনো ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিল।"

হরিবাবু বললেন, "বলো কী ? পাকা চোর তো !···তা টিকিটটা কোথায় ?"

"টিকিটটা আজই ছিঁড়ে ফেলেছে। খানিকটা আগে।"

"কেন, কেন ?"

"ধরা পড়ার ভয়ে। ওই যে আমরা বললাম, টিকিটটা দেখিয়ে টাকা চাইতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে চোর—সেই ভয়ে টিকিটটা নষ্ট করে ফেলেছে।"

"সে কী ! দেড় লাখ টাকা এইভাবে নষ্ট করল। পেনু বেচারির কপালে টাকাটা সইল না বিজন !"

"হ্যাঁ। যে চুরি করেছিল সে দেখল, টাকাটা আর সে পাবে না ; আবার পেনুকেও এখন ফেরত দিতে যাওয়া মুশকিল—ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই নষ্ট করে ফেলল।"

"চোরটা কে ?"

"গানের মাস্টার। তবে গানের মাস্টারের সঙ্গে বোধহয় বড়ালবাবুর সাঁট ছিল।"

"কেমন করে বুঝলে ?"

"দেশলাই দেখে," বিজন হাসল, "এই দেশলাইটা দেখুন। বড়ালবাবু ছাড়া এই দেশলাই কেউ ব্যবহার করে না। এ হল খাদি-দেশলাই। একেবারে আলাদা দেখতে। বড়ালবাবু এই দেশলাই মাগনা পান, তাঁকে দিয়ে যায় তাঁর এক পুরনো দোস্ত। খাদিতে কাজ করেন।"

হরিবাবু বোকার মতন বললেন, "তা হলে ?"

"তা হলে আর কী ! চোর ধরা পড়েও বেঁচে গেল। টিকিটই যখন নেই, তখন আর মামলা চালিয়ে লাভ হবে না।"

হরিবাবু বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "বড়াল যে পেনুর টাকা মারার চেষ্টা করবে—ভাবিনি। মানুষটার এত লোভ ! ছি ছি !"

বিজন বলল, "আমার কিন্তু বড়ালবাবুকে কোনোদিনই সাধুপুরুষ মনে হয়নি। লোকটা বেশ বাজে।"

বিজন আনন্দকে ডাকতে গেল। খবরটা দেওয়া দরকার।

ছবি : দেবাশিস দেব

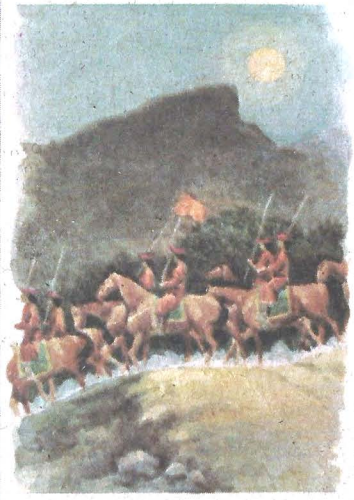

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব **হৈ হৈ কাণ্ড** চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

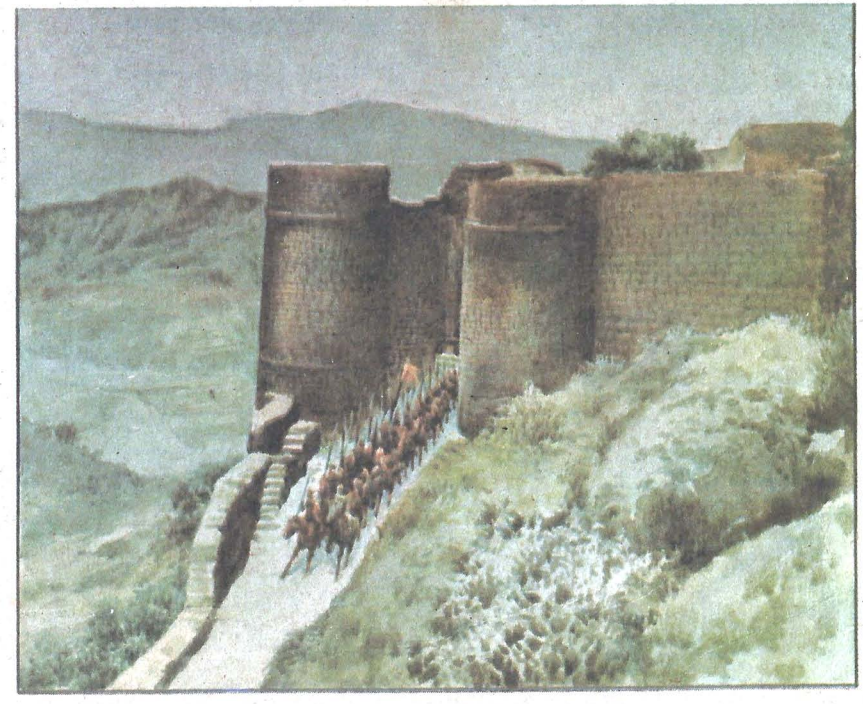

বৃষ্টিতে তেলেভাজা

লোডশেডিং আর গরমেতে
লাগছে না আর ভাল,
হঠাৎ দেখি আকাশেতে
মেঘ করেছে কালো।
ঝম-ঝম-ঝম বৃষ্টি এল
লাগছে ভাল তাই,
বোনকে ডেকে বলছি আমি
'চল্ ভিজতে যাই।'
মা রেগে কন,'গেলে পরে
দেব তোদের সাজা।'
হেসে বলি,'না গেলে কি
দেবে তেলেভাজা ?'

ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য (বয়স ১১)

টিয়াপাখি

আমার বাবা আমাকে রথের মেলা থেকে একটা সুন্দর টিয়াপাখি কিনে দিয়েছিলেন। আমি টিয়াপাখিটাকে একটা খাঁচায় রেখে দিয়েছি।

রোজ আমি পাখিটাকে খেতে দিই, কিন্তু ও শুধু চুপ করে বসে থাকে। বিকেলবেলায় যখন খেলতে যাই তখন ও আমার দিকে করুণভাবে চেয়ে থাকে।

একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—টিয়াপাখিটা বলছে, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।"

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে পাখিটাকে ছেড়ে দিলাম আমি। পাখিটা নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল।

সৌরভকান্তি চন্দ্র (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **গৌতম সামন্ত** (বয়স ১১)

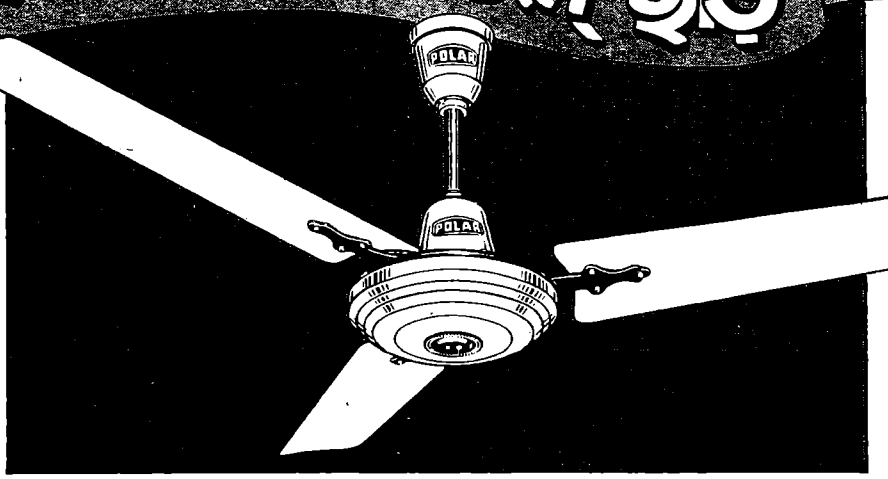

সবচেয়ে কমদামে
সবসেরা কোয়ালিটি
বিরাট অফ সীজন ছাড়
POLAR
POLAR
ঠিক তাই। এখনই পোলার পাখা কেনা সবচেয়ে লাভের কারণ বছরের কেবল এই মাসেই তা পাওয়া যায় সবচেয়ে কম দামে। এরপর প্রতিমাসেই দাম বাড়বে। সুতরাং আজই কিনুন — পোলার — আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে।
পোলার
সুপার পাখা
আজ্ঞে হ্যাঁ
এ'টি ৭ বছরের
গ্যারান্টিযুক্ত
ica 2448

বোহেমিয়ায় কেলেঙ্কারি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌সের পর্যবেক্ষণ-শক্তি অসাধারণ। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করে থাকেন। তাঁর বন্ধু ওয়াটসন একদিন হোম্‌সের বাড়িতে এসে জানতে পারলেন, নাম-ঠিকানাহীন কাগজে চিঠি লিখে গোয়েন্দার সাহায্য চেয়েছেন একজন। রাত পৌনে আটটা নাগাদ হোম্‌সের বাড়িতে এই ব্যক্তির আসার কথা। আত্মপরিচয় জানাতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিটি মুখোশ পরে আসবেন। কিন্তু চিঠিটি পরীক্ষা করেই হোম্‌স বুঝে ফেললেন, পত্রলেখক জার্মান এবং চিঠির কাগজটি বোহেমিয়ায় তৈরি। যথাসময়ে আগন্তুকের টোকা পড়ল গোয়েন্দার ঘরে।...

দরজা ঠেলে যিনি ঘরে ঢুকলেন উচ্চতায় তিনি সাড়ে ছ-ফুটের বেশি তবু কম নন। তাঁর হাত-পা বুকের ছাতি হারকিউলিসকে মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর জামাকাপড় খুব দামি। এত দামি যে, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত ভদ্রলোক একে বলবে রুচির বিকার। তাঁর ডবল-ব্রেস্টেড কোটের বুকে ও হাতায় আস্ট্রাখানের ভেড়ার লোমের বেড় আর লম্বা পটি দেওয়া। তাঁর ঘন নীল ক্লোকে লাল সিল্‌কের পটি বসানো। আর ক্লোকের ঘাড়ের কাছে একটা ব্রোচ। আর ব্রোচের ঠিক মধ্যিখানে দামি বেরিল পাথর বসানো। তাঁর বুট জুতোর, যা প্রায় পায়ের ডিম পর্যন্ত উঁচু, সামনে তামাটে রঙের 'ফার' দেওয়া। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক অসম্ভব ধনী। তাঁর হাতে একটা চওড়া আকারের টুপি। কিন্তু তাঁর মুখের ওপরের দিক মুখোশে ঢাকা। আমার মনে হল মুখোশটা তিনি ঘরে ঢোকবার আগেই পরেছেন। কেননা তাঁর একটা হাত তখনও উঠে ছিল। মুখের তলার দিকটা খোলা। তাঁর ঠোঁট আর চিবুকের গড়ন দেখলে বোঝা যায় তিনি যেমন জেদি আর তেমনি দৃঢ়চেতা।

"আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?" ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন। গলার স্বর যেমন গম্ভীর তেমনি কঠোর। উচ্চারণ জার্মানদের মতো। "আমি লিখেছিলুম যে আমি আসব।" আগন্তুক আমাদের দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। আমি বুঝলাম তিনি ধরতে পারেননি আমাদের মধ্যে কে শার্লক হোমস।

হোমস বললে, "আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডঃ ওয়াটসন। আমাকে আমার কাজে প্রয়োজনে সাহায্য করেন। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?"

"আমাকে আপনি কাউণ্ট ফন ক্রাম বলে ডাকতে পারেন। আমার দেশ বোহেমিয়া। আমি আশা করি আপনার এই বন্ধুটি ভদ্রলোক এবং কোনো গোপন কথা ফাঁস করে দেবেন না জেনে নির্ভাবনায় বলা যায়। তা যদি না হয় তো আমার সমস্যাটা আমি কেবলমাত্র আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

আমি উঠে যাবার জন্যে দাঁড়াতেই হোমস আমার হাত ধরে টেনে ফের বসিয়ে দিয়ে বললে, "আপনার ব্যাপারে হয় আমরা দুজনেই থাকব না হয় কেউই থাকব না। আপনার সব গোপন কথা আপনি স্বচ্ছন্দে এঁর সামনে বলতে পারেন।"

ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাউণ্ট বললেন, "বেশ, সব কথাই বলছি। তবে আপনাদের কথা দিতে হবে যে, দু বছরের মধ্যে এ সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশ করতে পারবেন না। তার পরে অবশ্য ব্যাপারটা জানাজানি হলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তার আগে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয় তো সমগ্র ইউরোপে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।"

হোমস বললে, "ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি।"

"আমিও।"

"কিন্তু কিছু মনে করবেন না, মুখোশটা আমি খুলতে পারব না। কেননা যিনি আমাকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি চান যে, তাঁর দূত হিসেবে আমি যেন আপনাদের অপরিচিতই থেকে যাই। ভাল কথা, আপনাদের কাছে আমার যে পরিচয় দিয়েছি তাও সম্পূর্ণ খাঁটি নয়।"

কিঞ্চিৎ নীরস গলায় হোমস উত্তর দিলে, "তা বুঝতে পেরেছি।"

"সমস্ত ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাতে করে কোনোরকম গালগপ্প, গুজব বা কুৎসা রটতে না পারে তার জন্যে আমাদের সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ব্যাপারের সঙ্গে বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজা অরমস্টাইনদের মান-সম্ভ্রম জড়িয়ে আছে।"

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ না খুলেই নিচু গলায় হোমস বললে, "এটাও আমি অনুমান করতে পেরেছিলুম।"

আমাদের অতিথি কিছুটা বিস্মিত হয়ে চোখ বুজে আলস্যে গা এলিয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে থাকা হোমসের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় ভাবছিলেন এই কি সেই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন দক্ষ রহস্যসন্ধানী যার সম্বন্ধে তিনি এক কথা শুনেছেন?

ধীরে ধীরে চোখ খুলে হোমস কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে বললে, "মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে সমস্যাটা আমাকে খুলে বলেন তো আমার পক্ষে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া সহজ হয়।"

হোমসের কথায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে, বোধহয় হতাশায়, একটানে মুখোশটা ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি বোহেমিয়ার রাজা। সত্য গোপন করে লাভ নেই।"

"ঠিকই বলেছেন। আপনি কোনো কথা বলবার আগেই আমি টের পেয়েছিলুম যে, আমি ভিলহেলম গটসরাইখ সিগিসমণ্ড ফন অরমস্টাইন, কাসেল ফালস্টাইনের গ্র্যাণ্ড

ডিউক, বোহেমিয়ার রাজার সঙ্গে কথা বলছি।"

তখন আমাদের রাজা অতিথি একটা চেয়ারে বসে নিজের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "বুঝতেই পারছেন যে এই ধরনের কাজে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু এটা এমনই একটা ব্যাপার যা কাউকেই বিশ্বাস করে বলতে পারি না। তাতে খবরটার গোপনতা থাকবে না। তাই বাধ্য হয়ে নিজের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন করে প্রাগ থেকে আমি আসছি আপনার সাহায্য ও পরামর্শের জন্যে।"

"তা হলে অনুগ্রহ করে সব কথা আমাকে যথাসম্ভব খুলে বলুন।"

"ব্যাপারটা এই : বছর-পাঁচেক আগে বিশেষ কারণে আমাকে বেশ কিছু দিন ওয়ারশ শহরে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে আমার আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অ্যাডলারের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন।"

"ডাক্তার, আমার ইনডেক্স থেকে ঐ নামটা বের করো তো।"

বহুকাল ধরে হোম্‌স নানা টুকিটাকি খবর সংগ্রহ করে আসছে। অনেকদিন ধরে সংকলন করার জন্যে এখন এমন হয়েছে যে, এমন কোনো বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তি নেই বা বিষয় নেই যার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু খবর তার সংগ্রহে নেই। ইনডেক্সের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক ইহুদি ধর্মযাজক আর নৌবিভাগের পদস্থ কর্মচারীর—যিনি গভীর সমুদ্রের মাছের ওপর খুব ভাল বই লিখেছেন—নামের মাঝখানে অ্যাডলারের নাম পাওয়া গেল।

"দেখি, দেখি" বলে হোমস বইটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিজেই পড়তে লাগল : "হুঁ হুঁ, জন্ম নিউ জার্সিতে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে।···Contralto তারপর La Scala...বেশ বেশ···। ওয়ারশ শহরে ইম্পিরিয়াল অপেরার প্রধান গায়িকা···অপেরা থেকে অবসর গ্রহণ···খুব ভাল···বর্তমানে লণ্ডন শহরের বাসিন্দা।" তারপর বইটা বন্ধ করে বোহেমিয়ার রাজার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সমস্যাটা কী?"

"ওয়ারশ শহরে থাকবার সময় আমার লেখা কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র অ্যাডলারের হাতে···"

তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে হোমস বললে, "আছে। এখন আপনি সেগুলো ফেরত পেতে চান অথচ তিনি ফেরত দিচ্ছেন না, তাই তো?"

"ঠিক।"

"সেই কাগজপত্রগুলো কি কোনো কিছুর দলিল?"

"না।"

"তবে আর ভাবনা কী? অ্যাডলার বা অন্য কেউ যদি কখনো ঐসব কাগজপত্র দেখিয়ে আপনাকে অপদস্থ করতে চায় তো সোজা বলে দেবেন ওসব জাল কাগজ।"

"কিন্তু যে কাগজে লেখা তা আমার ব্যক্তিগত প্যাডের কাগজ।"

"বলবেন একটা প্যাড চুরি গিয়েছিল।"

"হাতের লেখা যে আমার।"

"বলবেন কেউ আপনার হাতের লেখার নকল করে ওগুলো লিখেছে।"

"কাগজে আমার সিলমোহর করা আছে।"

"ও জাল সিলমোহর।"

"ওই সঙ্গে আমার একটা ছবিও আছে।"

"আপনার ছবি দোকান থেকে সংগ্রহ করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।"

"কিন্তু সে ছবিতে আমরা দুজনেই আছি।" বোহেমিয়ার রাজা একটু ইতস্তত করে বললেন।

"তাহলে অবশ্য মুশকিল। আপনি কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন।

"হ্যাঁ। তখন আমার বয়স আর বুদ্ধি দুই কম ছিল।"

হোমস একটু চুপ করে থেকে বললে, "তাহলে তো জিনিসপত্রগুলো উদ্ধার করতেই হয়, বিশেষত ঐ ছবিটা।"

"আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি।"

"তাহলে কিছু খরচ করে ওগুলো কিনে নিতে হবে।"

"ওঁর অভাব নেই। সুতরাং পয়সা দিয়ে কেনবার প্রশ্নই ওঠে না।"

"তাহলে চুরি করতে হয়।"

বোহেমিয়ার রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, "সে চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। দুবার পেশাদার চোরকে দিয়ে ওঁর বাড়িতে চুরি করানো হয়েছে। একবার অ্যাডলার যখন বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছিলেন ওঁর সমস্ত মালপত্র ইচ্ছে করে ভুল ঠিকানায় পাঠিয়ে তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করা হয়েছে। দুবার রাস্তায় ওঁকে জোর করে আটকে তল্লাশি করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাল পাওয়া যায়নি।"

"জিনিসগুলো কোথায় থাকতে পারে তার হদিসও পাওয়া যায়নি?"

"না। কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি।"

হোমস হেসে বললে, "আপনার সমস্যাটা সামান্য হলেও বেশ চিত্তাকর্ষক।"

মৃদু তিরস্কারের সুরে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "সমস্যাটা কিন্তু আমার পক্ষে খুবই গুরুতর।"

"কীভাবে," হোমস প্রশ্ন করলে।

"স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজার সঙ্গে কোনো একটা ব্যাপারে আমার যোগাযোগ হতে চলেছে। (সে ব্যাপারটা অবশ্য আপনার না জানলেও চলবে।) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজা অত্যন্ত গোঁড়া। যদি কোনো ভাবে তিনি জানতে পারেন যে, আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তাহলে ঐ যোগাযোগের ব্যাপারে তিনি আর এগোবেন না। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। তাতে আমারই ক্ষতি।"

"কিন্তু আইরিন অ্যাডলার এই ব্যাপারটা কী করে জানতে পারবে?"

"আগামী সোমবার এই সম্পর্কে খবরের কাগজে একটা সংবাদ থাকবে। তখন অ্যাডলার কেন বিশ্ব-সংসারের সবাই জেনে যাবে.। সুতরাং সোমবারের আগেই ঐ কাগজপত্রগুলো উদ্ধার করতে হবে।"

"তাহলে তো আমাদের হাতে এখনো দিন-তিনেক সময় আছে। ভালই হল," শার্লক হোমস বললে, "আমার হাতে দু-একটা জরুরি কাজ আছে। আপনি এখন লণ্ডনেই থাকছেন তো?"

"হ্যাঁ। কাউণ্ট ফন ক্রাম এই নামে আমি ল্যাংহ্যামে

উঠেছি।"

"ঠিক আছে। কাজ কীরকম এগোচ্ছে তা চিঠি দিয়ে আপনাকে জানাব।"

"অবশ্যই। বুঝতেই পারছেন যে এই ব্যাপারে আমি খুবই উদ্বিগ্ন আছি।"

"খরচাপত্রের ব্যাপারটা—"

হোমসকে শেষ করতে না দিয়ে বোহেমিয়ার রাজা বললেন, "যত খরচা হয় হোক। প্রয়োজনে আমি আমার রাজ্যের একটা অংশ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঐ ছবিটা আমার চাই-ই চাই।"

"তাহলে হাতখরচা বাবদ কিছু দেবেন কি?"

বোহেমিয়ার রাজা তাঁর ক্লোকের ভেতর থেকে শ্যাময় চামড়ার একটা পুরু ব্যাগ বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "এতে হাজার পাউণ্ড আছে।"

হোমস একটা কাগজে টাকার জন্যে রসিদ লিখে দিয়ে বললে, "অ্যাডলারের ঠিকানাটা কি আপনার জানা আছে?"

"ব্রিওনি লজ, সার্পেণ্টাইন অ্যাভিনিউ, সেণ্ট জনস উড।"

হোমস ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললে, "আর একটা কথা। ছবিটা কি ক্যাবিনেট সাইজের।"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে মহারাজা। আশা করি, দু-একদিনের মধ্যে আপনাকে কিছু সুখবর দিতে পারব। শুভরাত্রি।"

বোহেমিয়ার রাজা চলে যাবার পর হোমস আমাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বললে, "ওয়াটসন, যদি কাল বিকেলে তিনটে নাগাদ আসো তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

"মা, আমিও পরেছি"

Duckback®

গ্লেজড্ গামবুট - ছোট বড় সবার জন্য

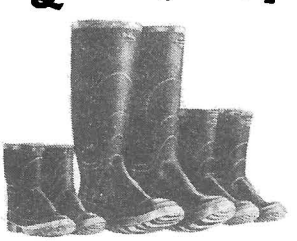

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

সবার সুরক্ষায় Duckback®

naa BWL-8475

নীল-সবুজের রাজ্যে

চিত্রা ঘোষ

বিকেলের পড়ন্ত সূর্য ধীরে-ধীরে গাছের মাথাটা ছুঁয়েছে। নিপু বসে বসে দেখছে আর ভাবছে, গাছটার কী মজা! কেমন হাত বাড়িয়ে সূর্যের আলোটুকু ছুঁয়ে ফেলল। ও কেন পারে না? তখনই কে যেন মনের ভেতর বলে উঠল, "চেষ্টা করে দ্যাখো না, তুমিও পারো কি না।" নিপু যেন হঠাৎ জেগে উঠল। ভাবল, কেউ বোধহয় তাকে লক্ষ করছে, আর কথাগুলো বলছে। এপাশে-ওপাশে তাকাল। কই, কোথাও তো কেউ নেই! তবে কি...? হঠাৎই যেন মনটা ভয়-ভয় করে উঠল। কিন্তু নিজেই আশ্চর্য হয়ে ভাবল, এখন তো সবে দুপুর, 'ওরা' কোথা থেকে আসবে? তবে বোধহয় মনের ভুল। এই ভেবে নিপু চুপচাপ বসে রইল নদীর পাড়ে।

নদীর এই পাড়টা নির্জন, বড় একটা কেউ আসে না। একপাশে হলদেবাড়ির শ্মশান, আর একপাশে ফেলে দেওয়া আবর্জনার স্তূপ। নিপুকে এই পাড়টা যেন অদ্ভুতভাবে টানে। তাই ফাঁক পেলেই সে চলে আসে এখানে। চেয়ে থাকে দূরের মাঠের দিকে, যেখানে নীলে-সবুজে মাখামাখি। মনে হয়, ওখানে ওর পরিচিত কেউ আছে, যে ওকে অনবরত হাতছানি দিয়ে ডাকে।

নিপুর এক একবার মনে হয়, ও চলে যাবে ওই নীল-সবুজের মধ্যে। তারপরেই মনে হয়, যদি বাড়ি ফেরার রাস্তাটা না চিনতে পারে? যদি আর ফিরতে না পারে? যদি আর মাকে, আর তিপুকে দেখতে না পায়? মনে হতেই নিপুর ডাগর-ডাগর নীল চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। টপ্-টপ্ করে দু ফোঁটা জল ওর হাঁটুর উপর পড়তেই হঠাৎ মনে হল, এ কী, ও কাঁদছে! ছি ছি, বারো বছরের ছেলে, ও এখন কত বড়। এখন কি বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্না তাকে মানায়? আবার চোখ দুটো মুছেই সে সামনে তাকাল। আর তখনই আবার দেখল, ওই নীল-সবুজ তাকে যেন ডাকল। কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সে উঠে দাঁড়াল। চলতে লাগল এমনভাবে, যেন কেউ হাত ধরে তাকে নিয়ে চলেছে।

চলছে তো চলছেই। মাঠের পর মাঠ, ধানখেত, পাটখেত, তিসিখেত, ঝোপজঙ্গল, সব পার হয়ে সে ছুটে ছুটে চলতে লাগল। কিন্তু নীল-সবুজ যে আরও দূরে, অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তবে কি নীল-সবুজও ওর সঙ্গে ছুটছে? একবার পরীক্ষা করার জন্য নিপু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখল, ওমা, তাই তো, নীল-সবুজও থেমে আছে। তখন নিপুর মনে হল, নীল-সবুজ ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দূরের কোনো দেশে। যেখানে আছে কেশবতী রাজকন্যা, আর অচিন দেশের রাজপুত্র। তবে তো ওকে যেতেই হবে। নিপু আবার ছুটতে লাগল। ছুটছে তো ছুটছেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। সন্ধের ধূসর আকাশ কালো চাদরে ঢাকা পড়ে গেল। তবু নিপু ছুটছে। সামনে বন-জঙ্গল কিছুই সে মানছে না। চলতে চলতে অন্ধকারে সামনের কিছুই ঠাহর হচ্ছে না।

হঠাৎ কিসে যেন পা দুটো জড়িয়ে ধরল। আঁতকে উঠে নিপু লাফ দিতে যাবে, হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। উঠতে গিয়ে দেখে, সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা। দাঁড়াতে গিয়ে দেখে, দাঁড়াতে পারছে না। নিপুর মনে হল, ও বুঝি মরেই যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, "বাঁচাও!"

মা ছুটে এসে ওকে ধাক্কা দিলেন, "কী রে, দুপুরবেলা তোকে ডাকাত ধরল নাকি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিস্? ওঠ।" মায়ের ডাকে ভরসা পেয়ে নিপু আস্তে-আস্তে চোখ খুলে দেখে, ওমা,'পথের পাঁচালি' পড়তে পড়তে তারই উপর মাথা রেখে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ও তখন নিজের মনেই হেসে উঠল, আর ভাবল, তবে কি নীল-সবুজটা মিথ্যে?

ছবি : অনুপ রায়

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

অবিলম্বে চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল। রয় গিলক্রিস্ট এখন একেবারে উন্মত্ত ঝটিকা। উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসকে। প্যাভেলিয়নমুখো ব্যাটসম্যানদের পিঠ দেখলেই হাসি ফুটে উঠছে তার মুখে, আকর্ণবিস্তৃত। আর খানিকক্ষণ পরেই পালটে যাচ্ছে তার মুখভঙ্গি। ব্যাটসম্যানদের ওপর তার জাতক্রোধ ফুটে উঠছে।

"গিলক্রিস্ট আজ সাংঘাতিক বোলিং করছে। একটু দেখে খেলো।" ড্রেসিংরুমেই কেউ আমাকে কথাটা বলল। কে বলল খেয়াল করিনি। কথাটা মনে রইল কেবল। চেয়ারের গায়ে দাঁড় করানো ছিল আমার ব্যাট। হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বাংলার চার উইকেট পড়ে গেছে মাত্র ৪২ রানে। এখনই ধস্ আটকানোর চেষ্টা করার উপযুক্ত সময়। এর চাইতে দেরি করে নামলে হয়তো সেটা বড় দেরি হয়ে যাবে। গায়ে সামান্য জ্বর, তবু ছ'নম্বরেই চলে গেলাম। নাউ অর নেভার। হয় এখনই, অথবা কখনোই নয়।

ক্রিজের দিকে যেতে যেতে দেখলাম আমার দিকে গিলি বেশ কড়াভাবে তাকিয়ে আছে। থাকবারই কথা। প্রথম ইনিংসে অমন ভয়ঙ্কর বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি অদম্য সেঞ্চুরির কথা এত সহজে ভুলে যাওয়ার নয়। তাছাড়া লড়াইয়ের প্রথম পর্বে হায়দরাবাদ পিছিয়ে রয়েছে, গিলক্রিস্টের মতো ক্ষমতাবান খেলোয়াড়ের উপস্থিতি ও অহঙ্কার সত্ত্বেও। এই অবস্থায় খুব ঠাণ্ডা মাথার লোকও আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ চোখে চাইত না, এ ব্যাপারে আমি শতকরা দুশো ভাগ নিশ্চিত। তার ওপর গিলির দলের লোককে ঘায়েল করেছে লেস্টার কিং। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি গিলক্রিস্টের মেজাজকে গনগনে উনুনের আঁচের মতো করে রেখেছিল। সুতরাং তার ওই কড়া চাউনিতে আমি মোটেই অবাক হইনি।

অবাক হলাম, যখন স্টান্স নিয়ে ক্রিজে দাঁড়ালাম। বোলারের দিকে চাইতেই আমার বিস্ময় চরমে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে গিলক্রিস্ট সোজা পৌঁছে গেছে সাইট-স্ক্রিনের কাছে। স্ক্রিনের রডে হেলান দিয়ে দাঁড়াল একটুক্ষণ। তারপর শুরু হল দৌড়। এমনিতেই গিলি বল করার আগে অনেকটা দৌড়ত। সেই দৌড়ের পরে বল দিত। সে ছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। এখন, সাইট-স্ক্রিন থেকে দৌড়ে এসে সে যে বলটা দেবে, সেটা অবশ্যই 'সুপার-ফাস্ট' ডেলিভারি হবে। ভাবছিলাম, গিলি কী চায়! স্টাম্প উড়িয়ে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে, না আমাকে অন্য সাইট স্ক্রিনে গেঁথে দিতে? মুহূর্তের মধ্যে আমার পেশী-স্নায়ু সব বিপদের আশঙ্কায় টানটান হয়ে গেল। মন বলে উঠল—সাবধান! খুব সাবধান! অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করো। দেখতেই পাচ্ছ, দৈত্য ধেয়ে আসছে। বেচাল কিছু হয়ে যেতে পারে।

বাউন্সার। একটা বিকট বাউন্সার ছিটকে এল আমার দিকে। আমি ঘাড় গুঁজে, শরীর বাঁকিয়ে ডুব দিলাম। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল বাউন্সারটা। হায়দরাবাদের উইকেটকিপার কে ছিল মনে নেই, হলফ করে বলতে পারি সেই বলটা হস্তগত করতে গিয়ে তার হাতের হাড়গুলো ভালমতো নাড়া খেয়েছিল। এবং সেই নাড়া খাওয়ার স্মৃতি বোধহয় তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মনে থাকবে।

বুঝেছিলাম, এস্পার নয় ওস্পার। গিলি চাইছে তার সব কিছু দিয়ে বাংলাকে গিলে ফেলতে। অন্ধ ক্রোধ আর অবাচীন অহঙ্কার নিয়ে আজ আমাদের ওপর গিলক্রিস্ট পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই বর্বরতার সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে। ভাবলাম, যা হয় হোক, বুক চিতিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। শুনলে অবাক হবে, ক্রুদ্ধ গিলক্রিস্ট একবার আমাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। একটা পুরনো ঘটনার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বেঁচে গিয়েছিলাম।

গোড়ায় একবার স্ক্রিনের থেকে দৌড়ে এসে বাউন্সার দিয়েছিল। মাঝপথে আরেকবার দেখলাম সে স্ক্রিনের কাছ থেকে ছুটে আসছে। এবার তার দৌড় এবং ভঙ্গি দেখে বিশেষ কিছু মনে না হলেও, বল দেওয়ার আগে আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন আমাকে ফের সতর্ক করে দিল। এবার আরও তীব্রভাবে। গিলক্রিস্টের কোনো কিছুই তখন আর আশ্চর্যের নয়। গিলি বল না দিয়ে ক্রিজ পার হতেই আমি তার মতলব স্পষ্টভাবে বুঝে ফেললাম। সোজা বল ছুঁড়ে মেরে আমাকে জানে মেরে দিতে চায়। একটা পুরনো ঘটনার কথা অমনি মনে পড়ে গেল। ল্যাঙ্কাশায়ার-লিগে এক সতেরো বছর বয়সী ব্যাটসম্যানকে আউট করতে না পেরে সে ক্রিজের ভেতর ঢুকে পনেরো গজ দূর থেকে সরাসরি বুকে বল ছুঁড়ে মেরেছিল। পাঁজরের কয়েকটা হাড় চুরমার হয়ে গিয়েছিল ছেলেটির। এই অপরাধে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়েছিল গিলক্রিস্টকে।

হঠাৎ সে-কথা মনে পড়তেই আমি ক্রিজ থেকে সরে গেলাম লেগ আম্পায়ারের দিকে। আমার সরে যাওয়া দেখে গিলক্রিস্ট আর বল ছুঁড়ল না। তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। মাঠে উপস্থিত দর্শকরা দেখলেন গিলক্রিস্ট বল করতে গিয়েও করল না। ক্রিজের খানিকটা ভেতরে ঢুকে এল এবং কোনো চেষ্টা করল না হাত ঘোরাবার। আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ ও নির্দোষ ঘটনা। একজন বোলারের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। হয়তো রানআপ ঠিক হয়নি বা প্রয়োজনীয় দৌড় সম্পূর্ণ করতে পারেনি বোলারটি। গিলক্রিস্টের মতলব আন্দাজ করা তাই দর্শকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। বুঝে সরে গিয়েছিলাম বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। পরে শুনেছি এই সরে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে অনেকে আমায় বিদ্রূপ করেছেন। আমার বক্তব্য, ক্রিকেট খেলতে এসেছি অযথা জান খোয়াবার জন্য নয়। গিলক্রিস্টের সামনে তখন জেদ করে দাঁড়িয়ে থাকা জীবনের চূড়ান্ত বোকামি ছাড়া আর কিছু হত না। (ক্রমশ)

উচ্চ-মাধ্যমিকে ফার্স্ট রোশনি

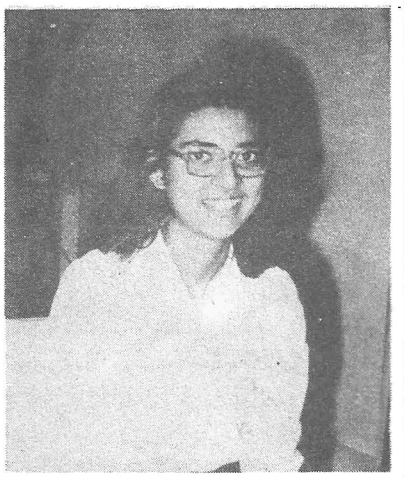

উচ্চ-মাধ্যমিকের রেজাল্ট যখন বেরিয়েছে, রোশনি তখন সিমেনা দেখতে ব্যস্ত। হল থেকে বেরিয়ে শোনে এই কাণ্ড। তারপর তো কিছুটা উত্তেজনা, হইচই, খুশি, আনন্দ। রোশনি মানে রোশনি সেন। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী। রোশনি এবার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম হয়েছে। এই নতুন কোর্স শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম একটি মেয়ে বিজ্ঞান বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করল।

মিণ্টো পার্ক গভর্নমেণ্ট হাউসিং এস্টেটে রোশনিদের সাত তলার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন হাসিমুখে রোশনিই দরজা খুলল। বাবা-মা আর তাঁদের একমাত্র সন্তান রোশনিকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বাবা, শ্রীশৈবাল সেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি।

রোশনি ক্লাস টু থেকেই সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ছে। ক্লাস এইট থেকে বরাবর ফার্স্ট হয়। মাধ্যমিকে তার স্থান ছিল ষোড়শ। তবে তার আরো ভাল করার ইচ্ছে ছিল। তাই উচ্চ-মাধ্যমিকে সে ইচ্ছাপূরণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা সফল। সে-ই এবার শীর্ষস্থানাধিকারিণী। পেয়েছে ৯১৬।

ইংরেজি বাংলায় বাবাই ছিলেন রোশনির প্রধান শিক্ষক। অন্যান্য বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে খুব সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে অঙ্কে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রসায়নে শ্রীমানস সান্যাল, পদার্থবিদ্যায় শ্রীঅঞ্জন দাশগুপ্ত এবং ইংরেজিতে শেষের দিকে শ্রীমতী লীনা গুহরায়। উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রস্তুতি হিসেবে রোশনি পদার্থবিজ্ঞানে দত্ত পাল চৌধুরী, রেজনিক-হ্যালিডের প্রথম খণ্ড, রসায়নে পি কে দত্ত এবং রণজিৎ দাশের বই, অ্যালজেব্রায় গাঙ্গুলি মুখার্জি, ট্রিগোনোমেট্রির জন্য দাস-মুখার্জি, কো-অরডিনেট জিওমেট্রিতে কে কে বসু ইত্যাদি বই এবং তারই সঙ্গে আই আই টির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অঙ্কে ভঞ্জ-গাঙ্গুলি, মাইতি-মাইতি এবং লোনির বই অভ্যাস করেছে। পদার্থবিদ্যায় নেলসন-পার্কারের বই থেকে প্রবলেম্‌স করেছে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে 'টেন টিচারস'-এর বই দুটিও তাকে খুব সাহায্য করেছে। তার ঐচ্ছিক বিষয় ছিল স্ট্যাটিসটিক্‌স। এই বিষয়ের থিওরি অংশের জন্য সে গুণ-গুপ্ত দাশগুপ্তর বই থেকে পড়েছে। প্রবলেম্‌স তৈরি করেছে এন জি দাসের বই থেকে। রসায়নে ফিনারের বই থেকে জৈব রসায়নের কিছু অংশ তৈরি করেছে।

প্রথমে সে ভেবেছিল, প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়বে। কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার পরে মত পরিবর্তন করে। রোশনি খড়্গপুর আই আই টিতে ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। পরে অবশ্য কম্‌পিউটার সায়েন্সেও চলে আসতে পারে। আই এস আইতেও সে চান্স পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কম্‌পিউটার নিয়ে তার গবেষণা করার ইচ্ছে আছে।

পুঁথিগত পড়াশোনার বাইরেও রোশনি পড়াশোনা করে, আর বেড়াতে দারুণ ভালবাসে। পি জি ওডহাউস, আগাথা ক্রিস্টি, ডিকেন্স তার খুব ভাল লাগে। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বেশিরভাগ লেখাই সে পড়েছে। জীবনানন্দ তার অন্যতম প্রিয় কবি।

রোশনি 'আনন্দমেলা' আর 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়মিত পড়ে। লীলা মজুমদার এবং সত্যজিৎ রায় তার প্রিয় লেখক। সে খুব ফেলুদা-ভক্ত। রোশনি ছবি আঁকতেও ভালবাসে, তবে এখন আর তেমন সময় পায় না। বালিগঞ্জ লেকের অ্যাণ্ডারসন ক্লাব থেকে সে সুইমার হয়েছে।

রোশনি সম্পর্কে আপাতত শেষ খবর : জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষাতেও সে ফার্স্ট হয়েছে।

অপরাজিতা

রবিবারের গল্প

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আজ রবিবার আজ তো ছুটি,
কিসের তাড়া ভোরে উঠি,
লেপের তলায় গুটিসুটি,
দিদি টানলে চুলের মুঠি
চেঁচিয়ে উঠে বলব, "ওমা,
আমি তোমার ছোট্ট সোমা,
একবারটি দ্যাখো তুমি,
করে যাচ্ছে কী দুষ্টুমি
তোমার বড় কন্যেটি যে
চন্দনা
বলছে, 'এবার উঠে পড়ো
খালি হাতে ব্যায়াম করো,
বিছানাপত্র তুলব সরো,
স্কার্টটা কাচো, বালতি ভরো,
শব্দের রূপ বল, নর,'
লাগছে আমার একটুও আ-
নন্দ না।
আচ্ছা না হয় উঠেই পড়লাম,
ঝাড়লাম মুছলাম ব্যায়াম করলাম,
জল বাড়ন্ত বালতি ভরলাম,
মাথা ঘষলাম স্নানটা করলাম,
অঙ্কের সিঁড়ি নামলাম চড়লাম,
তবুও কিসের আভাস পেলাম,
তারই টানে ছুটে এলাম,
জিভে যে জল,
সত্যি যে মা,
কী সুন্দর মাংস-কষার
গন্ধ না ?"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

বনভোজ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

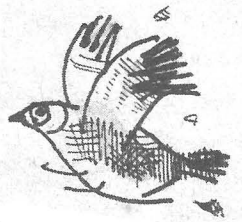

অংশু এবং বংশু দু'ভাই কংসাবতীর কূলে
জলসা হাওয়া মাখছিল গায় হাওয়াই জামা খুলে।
বাদলা—তাদের মাঠতুতো ফ্রেণ্ড, বঙ্কু—পাড়ার মামা
পাল্লা দিয়ে ঘামছিল, গায় জাপটে ডবল জামা।
একলাসেঁড়ে আধলা-মানিক মৌয়া-ছাওয়ার ভুষোয়
এই বড় এক ডিক্‌টিরি বই পড়ছিল মুখ খুঁশে।
বাবলু বিশে ঝিণ্টু বাদল শম্ভু শেতল তাতা
বনভোজনের ভোজ বানাতে তুলছিল বন মাথায়।

২

পাঁচ-ছ'টা কাগ নেই-আঁকুড়ে, গাঁও-খেদানো কুকুর,
চোখ-পাকানো স্যার যেন ওই সুজ্জি হাঁড়িমুখো,
বেহাল দুটো কটকটে ব্যাঙ, ধুঁয়োয় ধুঁয়ো হাঁড়ি—
গামছা বেঁধে নিস যদি তো খাই ফিরে নয় বাড়ি।
রোস না, ও কী! আর দুটো কাঠ ধরলে পরেই এবার
পাত বিছিয়ে হাত ভিজিয়ে লাগ টপাটপ সেবায়!
বাবলু মানিক ঝিণ্টু তাতা শম্ভু শেতল বিশে
পাত ক'টা গোছ কর গে যা না—নইলে খাবি কিসে?
কী বললি? সব তেমনি গোটা—জলডুবি ডালচালও?
তাই বলে তুই কাগ তাড়াতে হাঁকড়াবি ওই আলু?
আর দুটো কাঠ ধরুক না! দেখ, ভুর্‌ভুরে বাস উঠুক
অত্ত খেলি মেঠাই-পুরি, সইছে না তর ওটুক?

অংশু এবং বংশু দু' ভাই হাওয়ায় জামা ফোলা,
কংসাবতীর বাঁক পেরোতেই পথ পড়েছে খোলা—
আলগা ছাওয়া বসছে চেপে লাল কাঁকরের খাঁজে,
বঙ্কু বিশে কাতলা শেতল চলছে এ ওর মাঝে—
আধলা-মানিক আধ-রাঁধা মোট সেই পিঠে নেয় বয়ে,
ভ্যাপ্‌সা ধুলোর সাঁঝ-লাগা ভাপ উঠছে রয়ে রয়ে···
পথখানা ভার পায় যেতে সেও টলছে আঁকাবাঁকা,
ডাইনে-বাঁয়ে ঝোপড়া-লাগা চখ্‌রা মাটির ফাঁকা,
ওই রে মোড়ে দাঁড়িয়ে ও কে—ভূত নাকি ? না দানো ?
হাততালিতে ছুটছে শেয়াল ঝুলকালি জ্যাবড়ানো—
হুক্কো হুয়ো—তুলল ধুয়ো ! তোরাও গা না—চেঁচা—
কন্ধকাটা গাছ থেকে উই লম্ফ দিল পেঁচা।
শন্‌শনিয়ে উড়ছে, ও মা ! দীপ যেন, চাঁদমুখো—
ছলাক্ ছলাক্ উপচে আলোয় বানভাসি পথটুকু !
এই, দেখে চল, আছাড় পড়ে মরবি যে ! এই তোরা
দেখতে পেলি দোকানটা সেই লোধার ঘরের গোড়ায় ?
যাচ্ছি তো ঠিক ? ভুল যদি হয় ? বল, কে হবি দায়ী !
ওই তো রে বাস দিচ্ছে হরন্—ছোট্ সাড়া দে—যা ই ই—

ছবি : দেবাশিস দেব

গাবলু

খেলার টিকিট মিলছে না

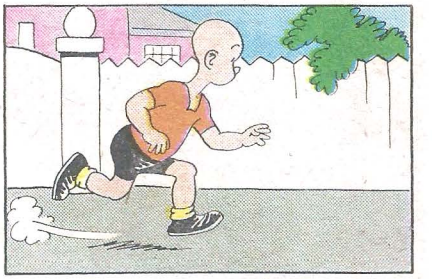

আজ চ্যাম্পিয়ানশিপের ফুটবল-ম্যাচ
টিকিট

খেলা দেখতে যেতে চাই!
আমিও

কর্তাকে বলা যাক যে দাদু মারা গেছেন।
বেশ

কালো ব্যান্ড

পরে নিয়ে কর্তার কাছে ছুটি চান
প্রতিটি ২০ পয়সা

গাবলু

মাছ ধরা নিষেধ

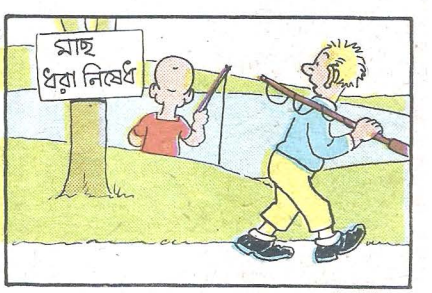
মাছ ধরা নিষেধ

মাছ ধরা নিষেধ

একী!
মাছ ধরা নিষেধ

ধরা নিষেধ

ফ্ল্যাশ গর্ডন

সুড়ঙ্গ ধরে গেলেই পুলিশের সদর-ঘাঁটি। আমি ফিরে যাচ্ছি, বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে।
আমি অনেক পাল্টে গেছি, অরা।
তাই তো দেখছি।
অরা ফিরে চলল…
আমি ফিরে চললুম।
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বইমেলার মেলা বই

বইমেলা মানেই মেলা বই। মেলা বই মানে বহু বই। আবার মেলা মানে এও হতে পারে যে, চোখের সামনে বইগুলো মেলা বা খোলা থাকে। তা, বিগত কলকাতা পুস্তকমেলায় তোমাদের জন্য নতুন আনন্দ-উপহার কী কী ছিল, তা কি জানো ? যারা জানো, তারা তো যোগাড় করেই নিয়েছো, যারা জানো না, তাদের জন্য বলি—এবারে বইমেলায় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে দারুণ-দারুণ সব বই বেরিয়েছে তোমাদের জন্য। 'ছোটদের বিজ্ঞানকোষ' নামে বইটি তো তোমাদের দারুণ কাজে লাগবে। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা নিয়ে সহজ করে আর সুন্দর করে পার্থসারথি চক্রবর্তীর লেখা এ-বইয়ের প্রথম খণ্ড হাতে পেলেই বুঝবে, হ্যাঁ, এটাই তো এতকাল খুঁজছিলাম। তারপর ছড়ার বই, 'ভূতগুলো সব গেল কোথায় ?' এ-বই তো বিদেশী বইকে হার মানাবে। সুধীর মৈত্রের ছবি আর রমাপদ চৌধুরীর ছড়া মিলে এক মলাটের মধ্যে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। উপন্যাসও বেরিয়েছে অনেকগুলো। শৈলেন ঘোষের, বুদ্ধদেব গুহর, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের, সমরেশ মজুমদারের। হ্যাঁ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও। প্রতিটি বইই দুর্ধর্ষ।

বইমেলার বই

শৈলেন ঘোষের ইতিমিচি সাহেব ১০·০০ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** খালি জাহাজের রহস্য ১২·০০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋভুর শ্রাবণ ১০·০০ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** নৃসিংহরহস্য ১০·০০ **সমরেশ মজুমদারের** খুনখারাপি ১২·০০ **রমাপদ চৌধুরীর ছড়া ও সুধীর মৈত্রের ছবি** ভূতগুলো সব গেল কোথায় ২০·০০ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** ছোটদের বিজ্ঞানকোষ ৫৫·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও ছোটদের বই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বই নিয়ে এতকাল শুধু বড়রাই টানাটানি করেছেন, এখন তোমরাও করবে। তোমাদের জন্য দু-খানি আশ্চর্য বই লিখেছেন তিনি। 'রুকুসুকু' এবং 'কলকাতার নিশাচর।' শেষোক্ত বইতে দু-দুটো রহস্যোপন্যাস একসঙ্গে ছাপা হয়েছে। 'কলকাতার নিশাচর' ও 'ক্যালিপসো থ্রম্বোফব'। দুটো রহস্য-উপাখ্যানেরই গোয়েন্দা এক দাদু ও তাঁর কিশোর নাতি। হারানো এক কাবলি বেড়ালের খোঁজে বেরিয়ে অনেক কীর্তিকাণ্ডের নায়ককে ধরে ফেলার গল্প নিয়ে একটি, অন্যটিতে চশমা থেকে এক আন্তর্জাতিক অপরাধীকে খুঁজে বার-করা। দুটোই দারুণ রোমাঞ্চকর। শুধু রোমাঞ্চ কেন, মুচমুচে মজা আর ফুরফুরে হাসিও কম নেই। 'রুকুসুকু' আবার একেবারে অন্য স্বাদের। এ-বই পড়ে জীবনকে আরও ঘন ও নিবিড় করে চিনতে শিখবে তোমরা। নিজেদের অজান্তেই কখন আর কীভাবে যেন বড় হয়ে উঠবে। জানতে শিখবে, বড় হওয়া মানেই শুধু হারিয়ে যাওয়া নয়। বড় হতে হতে, বড় হতে হতে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠার নামই আসল জীবন।

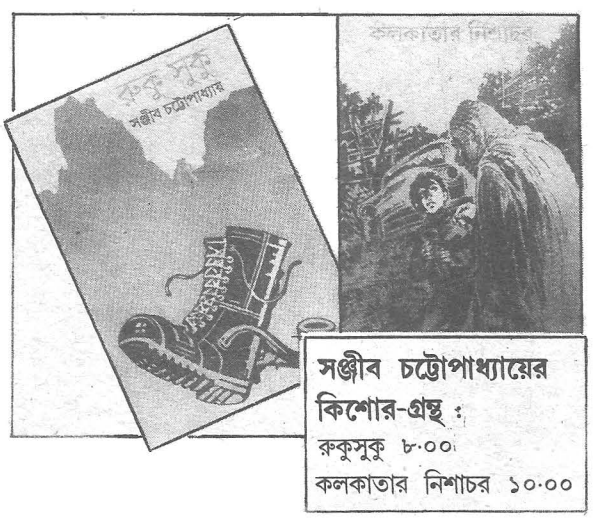

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর-গ্রন্থ :
রুকুসুকু ৮·০০
কলকাতার নিশাচর ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলকাতা-৯

ক্রিকেটের পণ্ডিতমশাই

চুনী গোস্বামী

ভাবতেও কষ্ট হয়, তবু যা সত্য তা তো আর না মেনে উপায় নেই। কার্তিকদা চলে গেলেন। খবরটা যখন প্রথম পাই, মনে হয়েছিল, 'পণ্ডিতমশাই' চলে গেলেন। কার্তিকদার কাছে আমি ক্রিকেট খেলা শিখিনি। তবু মনে হয়েছিল, বাংলার ক্রিকেটের গুরুবিয়োগ ঘটল। এখন তরুণ শিক্ষার্থীদের মাথার ওপর সেই উদার বিশাল বটের ছায়া নেই। যুবক ক্রিকেটাররা হারাল তাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষীকে, আর আমরা হারালাম অকৃপণ স্নেহময় শুভানুধ্যায়ীকে।

গভীর ক্রিকেট-পাণ্ডিত্যের জন্য, শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। '৫২ সালে আমি প্রথম বম্বে যাই, স্কুলদলের হয়ে ক্রিকেট খেলতে। আমাদের কোচ ছিলেন বার্ট ওয়েন্সলি। সেবার মার্চেন্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। হয়েছিল পঞ্চান্নতে, যেবার আমি প্রথম রোভার্স খেলতে যাই। আমাদের ডরমিটরির পাশে কাঙ্গা লাইব্রেরিতে এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। আলাপ করিয়ে দিলেন বলাই চ্যাটার্জি। বিজয় মার্চেন্ট। আমি একেবারে অভিভূত। মার্চেন্ট আমার স্বপ্নের মানুষ। নানা কথা হল। বললাম, বম্বেতে ক্রিকেটের পরিবেশ চমৎকার। খেলা শেখার হাজার রকম সুবিধে। দারুণ উইকেট, উপযুক্ত পরামর্শদাতা, অভিজ্ঞ কোচ...। হাঁ – হাঁ করে উঠলেন মার্চেন্ট। "তোমাদের বাংলাতেও তো দারুণ লোক রয়েছেন। বাবুজি, আই মিন কার্তিক বসু। গ্রেট ম্যান। ক্রিকেটটা অসম্ভব রকমের ভাল বোঝেন। অসীম পাণ্ডিত্য। এমন লোক ভারতবর্ষে কমই আছেন।" কার্তিকদার ওপর আমার শ্রদ্ধা এরপর অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল।

একবার হাজারে মোহনবাগান ক্লাবে এসেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন টাউন ক্লাবে যাওয়ার জন্য। "তোমাদের এখানে টাউন ক্লাবটা কোথায় ? আমি সেখানে যেতে চাই, কেউ আমায় নিয়ে যাবে ?" এ আর এমন কী কথা ! কিন্তু টাউন ক্লাবে কেন ? সবার মনে প্রশ্ন জাগল। মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে হল না, হাজারে নিজেই বললেন, তিনি 'গ্রেট' কার্তিক বসুর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই ক্রিকেটপণ্ডিত এবং যথার্থ রসিক ব্যক্তিটির সঙ্গে এখুনি দেখা করার ইচ্ছে হয়েছে তাঁর। কার্তিকদা তখন টাউন ক্লাবে কোচিং করতেন।

ছাত্ররা তো বটেই, এই লোকটির কাছে বহু বাঘা-বাঘা ক্রিকেটারও ঋণী। মার্চেন্ট সবিনয়ে স্বীকার করেছেন, প্রয়োজনমতো তিনি 'টিপস' নিতেন তাঁর প্রিয় 'বাবুজি'র কাছ থেকে। হাজারেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। মঞ্জরেকর, কেনি, কত নাম বলব ! মঞ্জরেকর, কেনির নাম উঠতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। বম্বেতে একদিন নেটে সুভাষ গুপ্তের গুগলিতে নিয়মমাফিক নাস্তানাবুদ হচ্ছেন ব্যাটসম্যানরা।

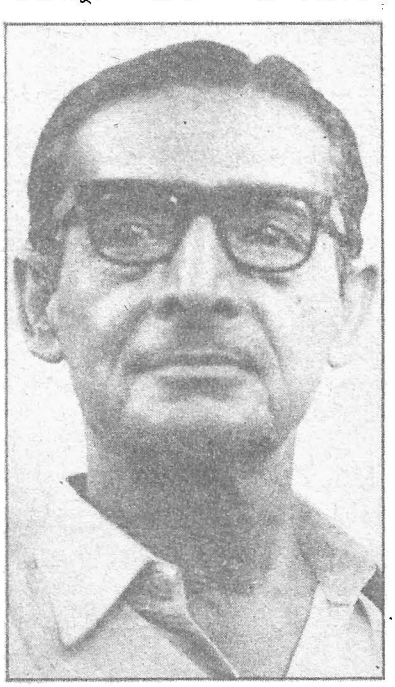

মঞ্জরেকররাও বাদ নেই। খুব হাসছেন সুভাষ গুপ্তে। কার্তিকদা নেটে ছিলেন। গুপ্তের গুগলিতে হাবুডুবু মঞ্জরেকর বাবুজিকে ধরে পড়লেন, এই গুপ্ত-রহস্য উদ্ধার করতেই হবে। ব্যাট নিয়ে উইকেটে এসে দাঁড়ালেন কার্তিকদা। এবং চমৎকার মোকাবিলা করলেন মারণাস্ত্রের। শুধু তাই নয়, চিনিয়ে দিলেন গুপ্ত-অস্ত্রটিকে। মঞ্জরেকরদের কৃতজ্ঞতার সীমা রইল না।

কে এস দলীপসিংজি, ক্রিকেট-দুনিয়ার এক বিরাট নাম। সেই দলীপসিংজিও কার্তিকদাকে খুব পছন্দ করতেন। শুধু কার্তিক বসুর ছাত্র এই সুবাদে সুনীল ব্যানার্জি, নিমাই ঘোষ, নিমাই কর প্রমুখদের একবার নিজের উদ্যোগে বম্বে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সুনীল, নিমাই, ওঁরা দিনটাকে অবিস্মরণীয় বলে মনে করেন। স্বাভাবিক। ক্রিকেটের 'টেকনিক্যাল কোচ' কার্তিকদা এমনই খ্যাতিমান ছিলেন।

মনে আছে, '৫৬ সালে দেশপ্রিয় পার্কে মিলন সমিতি বনাম কালীঘাটের খেলায় গুপ্তের বিরুদ্ধে হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলাম। গুপ্তে কালীঘাটের হয়ে খেলেছিলেন। তার পরে ষাট সালে লণ্ডনে গুপ্তের সঙ্গে দেখা। আমি কার্তিকদার ছাত্র নই কথায় কথায় বলেছিলাম। শুনে গুপ্তে অবাক। "তাহলে তুমি গুগলিগুলো অমনভাবে খেললে কী করে ?" বুঝে দ্যাখো, কী দুর্দান্ত ইমেজ গড়েছিলেন কার্তিক বসু।

নিজেকে অত্যাবশ্যকভাবে ক্রিকেটার বলে কখনও ভাবিনি। ভাবতে পারি না। মূলত আমি ফুটবলার। কিন্তু ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই ছিল। তাই ক্রিকেট শিখেছি, খেলেছি। কার্তিকদা বলতেন, "চুনী, তোমার ড্রাইভ ভাল নয়। স্ল্যাশ মারতে তুমি। কেন জানো ? তোমার ব্যাট ঘোরানো ছোট পরিধিতে হত।" বহুদিন ভেবেছি, কার্তিকদার কাছে সঠিক ড্রাইভটা শিখে নেব। তা আর হয়ে ওঠেনি। হয়তো আমি তাঁর ঘরানার লোক নই বলে। এই দুঃখটা আমার চিরকাল থেকে যাবে।

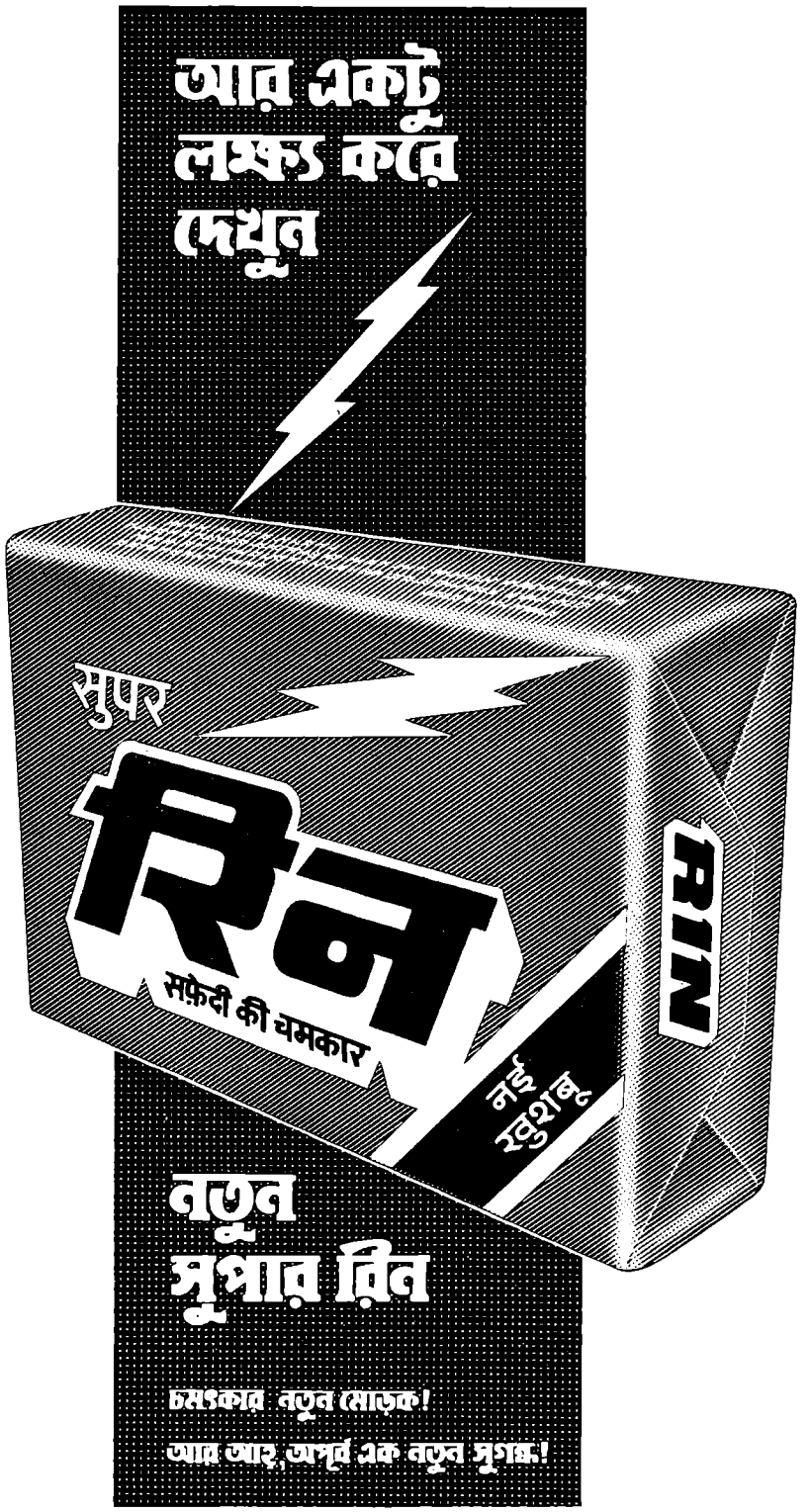

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের যে সাধ্য নেই

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

LINTAS RIN 75 2316 BG

লর্ডসের লর্ড গর্ডন গ্রিনিজ

অশোক রায়

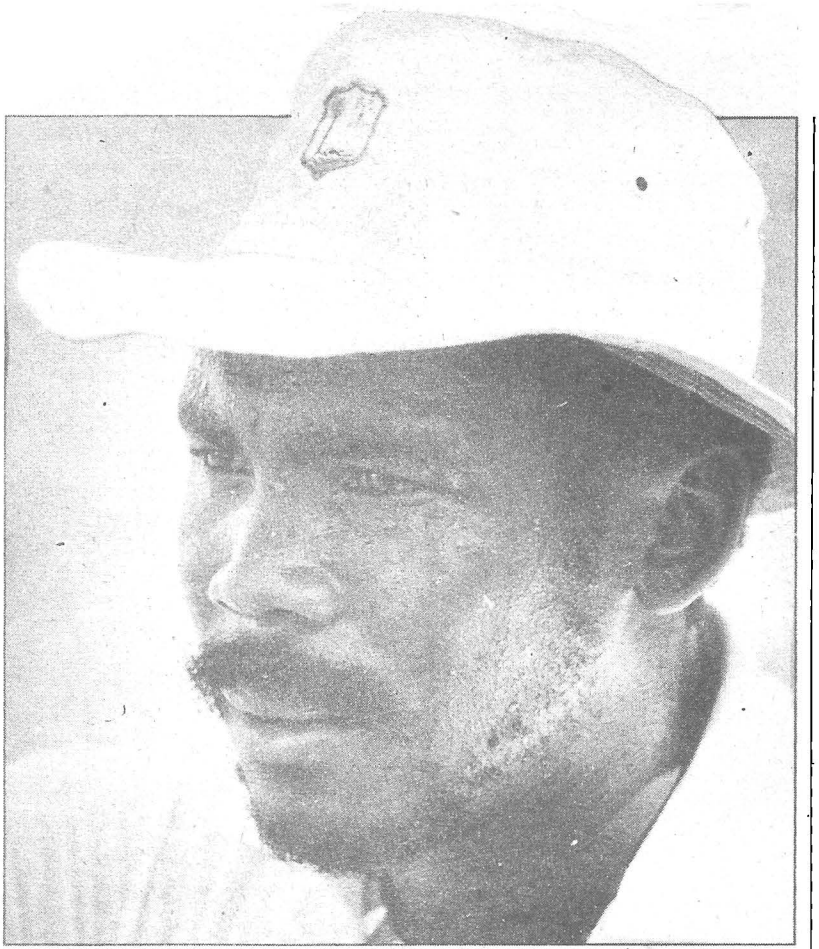

ঠিক জানি না, রংমশালের ব্যবসাটা সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজেই শুরু হয়েছিল কি না। তবে এটা ঠিক, রানের রংমশালের কারবারটা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদেরই একচেটিয়া। কথাটা প্রমাণ করার জন্যে ক্রিকেটের হেডকোয়ার্টার্স লর্ডসকেই বেছে নিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। এবং ব্যাটের শৈথিল্যহীন আক্রমণে লর্ডসের ঘাসে ঘাসে রানের আগুন ঠিকরে তুলে এক অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে নিল। হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টের কথা বলছি।

ক্লাইভ লয়েড টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়ে শুরুতেই 'মার্শালাতঙ্কের' যে চাপ ইংরেজদের ওপর ছড়াতে চেয়েছিলেন, দুই ওপেনার ফাউলার এবং নবাগত ব্রড প্রথম উইকেটে শতাধিক রান সংগ্রহ করেও সে-চাপের ফাঁস থেকে পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের আড়াল করতে পারেননি। ইংল্যাণ্ড শেষ হল ২৮৬ রানে। ইনিংসটিতে মার্শালের টর্পেডোতে ঘায়েল ছটি উইকেট।

ইংল্যাণ্ডের রানকে মধ্যবিত্তের কোঠায় বেঁধে রেখে ব্যাট হাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামল খুশিতে ফুরফুর করতে করতে। কিন্তু 'গ্রেট' ভিভের বাহাত্তর রানের ঝড় এবং সপ্তম-সাতহাজারি ক্লাইভ লয়েডের সংযমী ইনিংস সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডের রান ছুঁতে পারল না একটি কারণে, বথামের দাপটে। ইদানীং কোনো-কোনো মহলে এই সন্দেহটা উড়ে বেড়াচ্ছিল যে, বথামের ক্রমাগত ওজনবৃদ্ধি তাঁর বলের ধার দ্রুত ভোঁতা করে দিচ্ছে। ১০৩ রানে আট ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে প্যাভিলিয়ানে ফেরত পাঠিয়ে রটনাকারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে দিলেন বথাম। কথাটা আরেকবার প্রমাণিত হল যে, ভয়ঙ্করভাবে ফর্মে ফিরতে পারেন একমাত্র প্রতিভাবানরাই।

দ্বিতীয় দফায় অ্যালান ল্যাম্বের শতরান এবং বথামের একাশির সহযোগিতায় ইংল্যাণ্ড তিনশো রানে পৌঁছতেই অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৩৩০ মিনিটে ৩৪২ রান তুলে জেতার চ্যালেঞ্জ জানালেন। কাজটা স্পষ্টতই বিপক্ষ ব্যাট্সম্যানদের পক্ষে কঠিন ছিল। কিন্তু চতুর্থ ইনিংসে প্রায় সাড়ে তিনশো রানে পিছিয়ে থাকার চাপটুকু যে তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি সেটা প্রথম থেকেই বোঝাতে শুরু করলেন ওপেনার গর্ডন গ্রিনিজ। প্রথম ইনিংসের হিরো বথাম এবং উইলিসসহ ইংল্যাণ্ডের যাবতীয় বোলিং আক্রমণই সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসে নির্দয় গ্রিনিজের দাপটে। মাত্র ২৪১ বলে একটি ছক্কা এবং ঊনত্রিশটি বাউণ্ডারি সহযোগে গ্রিনিজ পৌঁছন ২১৪ রানে। মুগ্ধ লর্ডস একবার চমকে উঠেছিল যখন আত্মবিশ্বাসের চুড়োয় দাঁড়িয়ে গ্রিনিজ ১৯৭ থেকে দুশো পেরোলেন, একটি বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে। ক্রিকেটের পীঠস্থানে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে প্রথম ডবল সেঞ্চুরির কৃতিত্ব উঠে এল গ্রিনিজের নামের পাশে। শুধু ম্যাচ জেতানো নয়, একটি স্বপ্নের ইনিংস খেলে 'লর্ডসের লর্ড' হয়ে গেলেন গ্রিনিজ। গ্রিনিজের পাশে গোমসের নিস্তরঙ্গ বিরানব্বই উপেক্ষিত হয়েই রয়ে গেল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতল ন' উইকেটে।

এর আগে বার্মিংহামে প্রথম টেস্টেও ইংল্যাণ্ড হেরেছিল এক ইনিংস ও একশো আশি রানে। রিচার্ডস এবং গোমসের জোড়া সেঞ্চুরি, লয়েডের অধিনায়কোচিত ৭১ এবং নবম উইকেটে ব্যাপটিস্ট হোল্ডিংয়ের দেড়শো রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পৌঁছে দিয়েছিল ৬০৬ রানে। ওই বিশাল রানের পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে গার্নার এবং মার্শালের তোপের মুখে ইংল্যাণ্ড দু-ইনিংসে উড়ে গেল ১৯১ ও ২৩৫ রানে। কিছুটা প্রতিরোধ গড়েছিলেন বথাম। কিন্তু একা বথামের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থাবা থেকে ম্যাচ বার করে আনা সম্ভব ছিল না।

সিরিজের প্রথম দুটি টেস্টেই হেরে যাবার পরে রানহীন যে মানুষটির চোখ থেকে 'ঘুম' উবে গেছে, তিনি ইংল্যাণ্ডের নতুন অধিনায়ক, ডেভিড গাওয়ার।

উইম্বলডনে ম্যাকেনরোর সংহার-মূর্তি

সুব্রত সিংহ

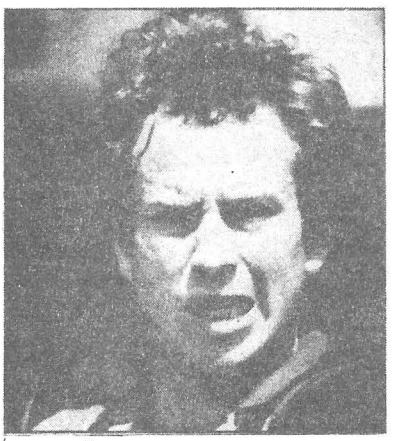

জন প্যাট্রিক ম্যাকেনরো

প্রত্যাশামতোই এবারের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলসে বিজয়ী ও বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করলেন দুই শীর্ষ বাছাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ম্যাকেনরো ও মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। টেনিস-জগতে এই দুজনই এখন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। গতবারেও এই দুজনই ছিলেন এই আসরের বিজয়ী ও বিজয়িনী।

যাই হোক, এবার আসা যাক ফাইনাল খেলার প্রসঙ্গে। প্রথমে বলি পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলা নিয়ে। এ বছর এই বিভাগে ফাইনাল খেললেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বাঁ-হাতি টেনিস-তারকা জন প্যাট্রিক ম্যাকেনরো ও জিমি কোনর্স। ম্যাকেনরো ছিলেন প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই ও কোনর্স ছিলেন তৃতীয় বাছাই। সেণ্টার কোর্টে উপস্থিত দর্শকদের অন্তত এটুকু আশা ছিল যে, তাঁরা টেনিসের এই দুই সেরা খেলোয়াড়ের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে পাবেন। কিন্তু এ বছর দুর্দান্ত ফর্মে আছেন ম্যাকেনরো, তাঁর সামনে পড়ে কোনর্স যেন পায়ের তলার মাটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মাত্র এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটেই কোনর্স বিধ্বস্ত হলেন ম্যাকেনরোর হাতে।

এবারের ফাইনাল নিয়ে ম্যাকেনরো উপর্যুপরি ছ'বার ফাইনাল খেলে বিজয়ী হলেন তিনবার—১৯৮১, '৮৩ ও '৮৪। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে তিনিই হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি পর পর দুবার এই প্রতিযোগিতা জয় করলেন। তাঁর আগে যিনি এই গৌরব অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন ডোনাল্ড বাজ। বাজ ১৯৩৭ ও '৩৮ সালে এই প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন।

ম্যাকেনরো সিঙ্গলস ছাড়া ডাবলসেও জিতেছেন পিটার ফ্লেমিংকে জুড়ি নিয়ে। ফাইনালে তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার প্যাট ক্যাশ ও পল ম্যাকনেমিকে পাঁচ সেটের খেলায় হারিয়ে খেতাব ও চল্লিশ হাজার পাউণ্ড লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ম্যাকেনরো সিঙ্গলস জিতে পেয়েছিলেন এক লক্ষ পাউণ্ড ও সুদৃশ্য ট্রফিটি।

আগেই উল্লেখ করেছি, মহিলাদের সিঙ্গলসটি ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভরা। পয়লা নম্বর বাছাই ও সদ্য গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বিজয়িনী মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ও দু নম্বর বাছাই ক্রিস এভার্ট লয়েড, দুজনেই সেদিন যথেষ্ট উঁচুমানের টেনিস উপহার দিয়েছিলেন সেণ্টার কোর্টের দর্শকদের।

মার্টিনা

মার্টিনা এবার যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে খেলে চলেছেন, তাতে করে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, তিনি হয়তো ক্রিসকে দাঁড়াতেই দেবেন না। কিন্তু ক্রিস সেদিন অন্য মেজাজে ছিলেন। প্রথম সেটের প্রথম ও তৃতীয় গেমে মার্টিনার সার্ভিস ভেঙে ক্রিস যখন ৩—০ গেমে এগিয়ে যান, তখন অনেকের সঙ্গে বিস্মিত ও বিচলিত হয়েছিলেন মার্টিনাও। তবে মার্টিনা নিজেকে ফিরে পেতে বেশি সময় লাগাননি। খেলার পদ্ধতি বদল করে নেটের কাছে এসে খেলে ক্রিসকে বিচলিত করে তোলেন। শেষ পর্যন্ত টাই-ভাঙা পদ্ধতি প্রয়োগে মার্টিনা ৭—৬-এ সেটটি জিতে নেন। এরপর দ্বিতীয় সেটটি মার্টিনা জিতেছেন ৬—২-এ। অনেকেই হয়তো মনে করবেন যে, মার্টিনা সহজেই সেটটি জিতেছেন। কিন্তু ক্রিস এই সেটেও যথেষ্ট আক্রমণাত্মক টেনিস খেলে দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছিলেন। ক্রিস সত্যিই সেদিন তাঁর টেনিস-জীবনের অন্যতম সেরা খেলা খেলেছিলেন।

উইম্বলডনের সিঙ্গলসে মার্টিনার এটি পঞ্চম জয়। তা ছাড়া এবার নিয়ে তিনি পর পর তিনবার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হলেন।

সিঙ্গলস ছাড়া ডাবলসেও মার্টিনা খেতাব জেতেন পাম শ্রিভারকে জুড়ি নিয়ে।

এবারের আসরে ভারতীয়দের ভূমিকার কথায় আসা যাক। বিজয় অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণন, এই দুজনই এবারের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিজয় প্রথম রাউণ্ডে হেরে গেলেও রমেশ কিছুটা সুনাম অর্জন করেছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে তিনি গতবারের ফাইনালিস্ট নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিস লিউইসকে সরাসরি তিন সেটের খেলায় হারিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় রাউণ্ডে তিনি হেরে যান ঠিকই, কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর। একাদশ বাছাই দক্ষিণ আফ্রিকার কেভিন কারেন জেতেন চার সেটের লড়াইয়ে। খেলার ফল ৬—২, ৩—৬, ৭—৬, ৭—৬। খেলার ফলই বলে দিচ্ছে যে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে রমেশের পক্ষেও ম্যাচটি জেতা খুব একটা কঠিন হত না।

প্রেমপত্র আর অঙ্ক জটিল
দুয়ের মধ্যে আছে কি মিল ?

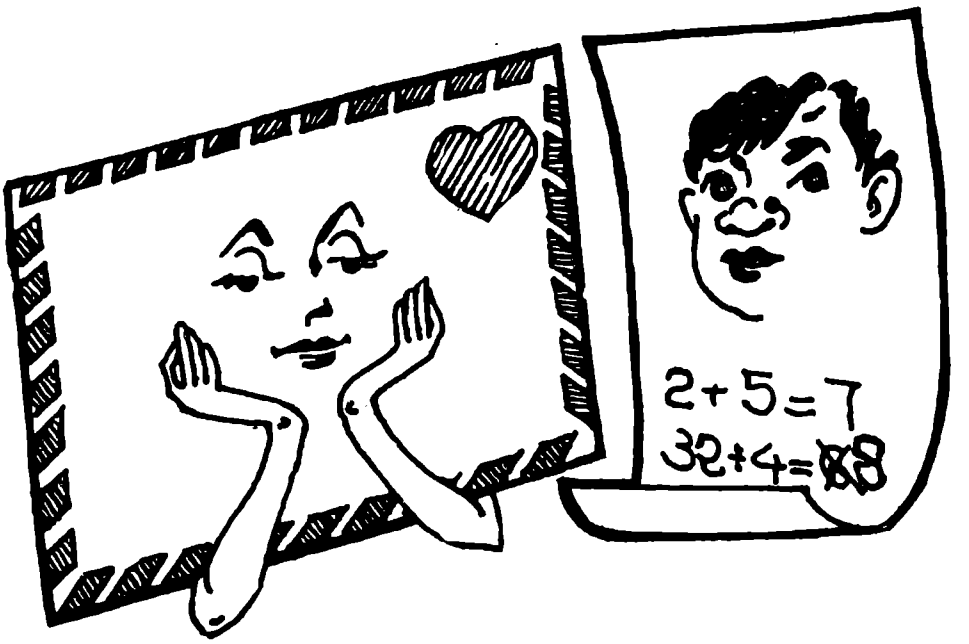

Chelpark

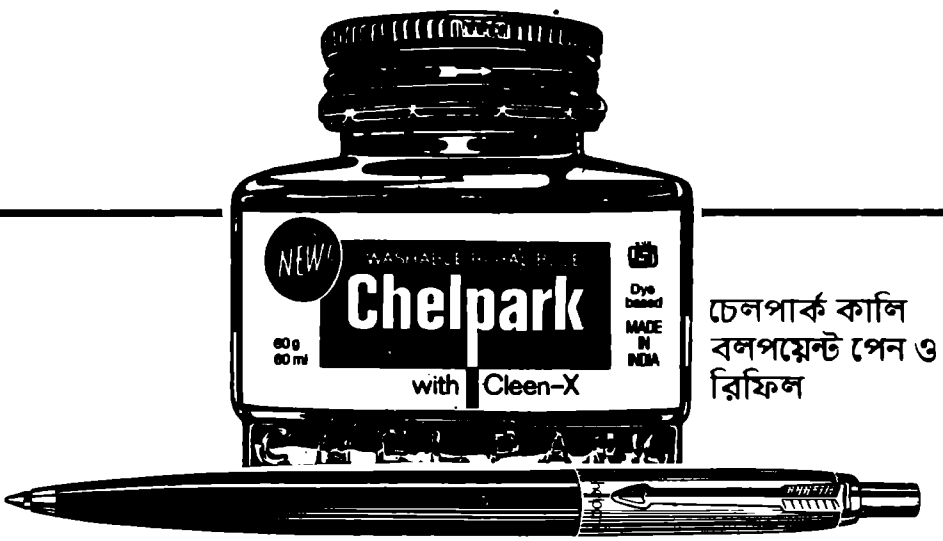

চেলপার্ক কালি
বলপয়েন্ট পেন ও
রিফিল

যে নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের
আঙুলের ডগায়।

CCL-1597

"একটুখানি খাটিয়ে মাথা জুড়ে পরের পর
ওকে দিয়ে সাজিয়ে তোলো তোমার খেলাঘর!"
—ফেভি ফেয়ারী

চট্‌পট্‌ করতে
কোনোকিছু গড়তে
এট-ওটা সাঁটানোর
সময়টা কাটানোর
সবসেরা মজাদার
ফেভিকল এম-আর।
আমোদই শুধু নাই
হাত বসে পাওয়া চাই
বড় হয়ে দেখো ঠিক
হবে বড় যান্ত্রিক।
আজ শুধু মণিহারী
খেলনার রকমারি
পুতুলের ঘরদোর
বাঘা-হাতি-বান্দর
ছোটদের হাতে দাও
আলমারিতে সাজাও
টিকে যাবে বরাবর
নিখুঁত যে এর জোড়
একেবারে নয়া হয়ে
চিরকাল যাবে র'য়ে
চিরসাথী যে তোমার
ফেভিকল এম-আর।

ওলি প্যাঁচা কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে,
সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি
পাঠান বা এই/ঠিকানায় লিখুন : "ফেভি ফেয়ারী"
পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

ওলি প্যাঁচা কি ভাবে ধাপে ধাপে বানাতে হবে, সে বিষয়ে **বিনামূল্যে** তথ্যের জন্য এই কুপনটি এই ঠিকানায় পাঠান : "ফেভি ফেয়ারী", পোষ্ট বক্স ১১০৮৪, বোম্বাই ৪০০ ০২০

নাম: __________
বয়স : __________
ঠিকানা : __________
সহর : __________
রাজ্য : ______ পিনকোড : ______
আপনি কি আমাদের ফেভিক্র্যাফট্‌ পত্রিকাটি পেয়েছেন ? হ্যাঁ/না (A)

® এম-আর
ফেভিকল
সিন্থেটিক অ্যাডহীসিভ

সেরা জিনিষ গড়তে চাও সেরাটি দিয়েই জুড়ে নাও

® Both ® and FEVICOL brand are
Registered Trade Marks of PIDILITE INDUSTRIES PVT. LTD. Bombay 400 021

OBM/3402 BN